আমার বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমার বাংলা

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ ঃ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
জুন ১৯৬১

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা ১

মুদ্রক :
রমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

১

'পদাতিক'-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই বহন করে এনেছিলেন, এবং দেখামাত্র মনে হয়েছিল, সে পরিচয়ে কোন মেকী নেই।

তারপর সুভাষ পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বেরিয়েছিলেন দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় নেবার জন্য, তাদের দুঃখ সুখ, আনন্দ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণের জন্য, নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্য। সে-সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর সুভাষের অজ্ঞাতবাস, নাগর সাহিত্যের মুখর কোলাহল থেকে আত্মনির্বাসন। এ-অজ্ঞাতবাস, ঐ-নির্বাসন ব্যর্থ হয়নি; পদাতিক জীবন তাঁকে নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে, দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়েছে। এই তো যথার্থ আত্মপরিচয়।

'আমার বাংলা' এই পরিচয়-সাধনার ইতিহাস এবং সাধন-অভিজ্ঞতার আনন্দময় কাব্য।

দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করা—এর চেয়ে গভীরতর জীবন-উৎসের কথা আমি জানিনে। সুভাষ সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং তার সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। কোথায় যেন তাঁর সঙ্গে গভীর একটি আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হলো—এই আমার একান্ত আনন্দময় স্বীকৃতি।

নীহাররঞ্জন রায়

২

বেশ ছিল।

শেয়ালদায় যাও। টিকিট কাটো। তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তরে কি পুবে — যখন যেখানে মন চায়। ভেড়ামারা পার হয়ে সাড়ার পুল। নিচে তাকিয়ে মনে হবে পদ্মার ঢেউগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে গিলতে আসছে। কিংবা যাও গোয়ালন্দে। ভাজা ইলিশের গন্ধ স্টিমারঘাট অব্দি পেছনে ডাকতে ডাকতে যাবে।

আজ জলেস্থলে গণ্ডী আঁকা। সে গণ্ডী পার হবার হুকুম নেই।

দিন বদলেছে।

AMAR BANGLA

Subhas Mukhopadhyay

সূচী

গারো পাহাড়ের নিচে

চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই ; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।

গারো পাহাড়ে যারা থাকে, বছরের এই সময়টা তারা চাষবাস করে। তাদের হাল নেই, বলদ নেই — তাছাড়া পাহাড়ের ওপর তো শুধু গাছ আর পাথর। মাটি কোথায় যে চাষ করবে ?

তবু তারা ফসল ফলায় — নইলে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে ? তাই বছরে এমনি সময় শুকনো ঝোপে ঝাড়ে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কি যে সে আগুন ? যেন রাবণের চিতা -- জ্বলছে তো জ্বলছেই। বছরের এমনি সময় যেন বনজঙ্গলের গাছপালারাও ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে।

•

জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন হয় মজা। বনের যত দুর্ধর্ষ জানোয়ার প্রাণ নিয়ে পালাই-পালাই করে। বাঘ-অজগর, হরিণ-শুয়োর যে যেদিকে পারে ছোটে। আর পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধ্যেবেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিরে নাচ আর গান।

এদিকে আস্তে আস্তে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা, তার ওপর বীজ ছড়াতে যা সময়। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে — মাথা চাড়া দেয় ধান, তামাক, আরও কত ফসল।

আমরা এই লোকগুলোর এত কাছে থেকেও পর; শুধু জানি, উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে — দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবরও রাখি না।

কাছাকাছি গিয়েছিলাম একবার।

গারো পাহাড়ের ঠিক নিচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ী যাবার যে রাস্তা, সে-রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বরী নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট — কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছ, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমীরের দাঁত। পাহাড়ী নদী সোমেশ্বরী — সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে!

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানী মাঝির মেজাজ যদি ভাল থাকে,

তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়ত গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারী মনিব বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

পাহাড়ের নিচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মত হালবলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ী ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-বানাই-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত' কে তারা 'ট' বলে, 'ট' কে 'ত'; আবার 'ড' কে তারা 'দ' বলে, 'দ' কে 'ড'। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগীও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ী স্বভাব। বুনো জন্তুজানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এই অঞ্চলে হাজংরাই সংখ্যায় সব থেকে বেশী। 'হাজং' কথার মানে নাকি 'পোকা'। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংরাই প্রথম আসে; আর তখন চাষবাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ী গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং—অর্থাৎ চাষের পোকা।

ধানের ক্ষেত দেখলে কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। একটু কষ্ট করে যদি পাহাড়ে না হোক একটা টিলার ওপরেও ওঠো — নিচের দিকে তাকালে দেখবে পৃথিবীটা সবুজ। যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান — একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্লাদে হঠাৎ সবুজ হয়ে গেছে।

এত ফসল, এত প্রাচুর্য — তবু কিন্তু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় জীবনে তাদের শান্তি নেই। একটা দুষ্টু শনি কোথাও কোন্ আনাচে যেন লুকিয়ে আছে। ধান কাটার সময় বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সবাই কাস্তে নিয়ে মাঠে ছুটবে; পিঠে আঁটি-বাঁধা ধান নিয়ে ছোট ছোট ছেলের দল কুঁজো হয়ে খামারে জুটবে। কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না। পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে আসে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। সে এক মজার ধাঁধা। তখন তারা গালে হাত দিয়ে যেন বলে:

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে;
বারবার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।
মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।
একদা কাস্তে নিই সকলে।
লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা॥

গাঁয়ের আল-বাঁধা রাস্তায় লোহার খুর-লাগানো নাগরায় শব্দ হয় খট্ খটাখট্ --- দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। খিট্‌খিটে বুড়িরা শাপমুন্নি দিতে থাকে। জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে চাষীরা ফকির হয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ-অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল — তাকে বলা হত হাতি-বেগার। জমিদারের বেজায় শখ হাতি ধরার। তার জন্যে পাহাড়ে বাঁধা হবে মাচা। মাচার

ওপর সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে নিরিবিলিতে বসবেন জমিদার ; সেই সঙ্গে পান থেকে চুন না খসে তার ঢালাও ব্যবস্থা। আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চালচিঁড়ে বেঁধে। যে জঙ্গলে হাতি আছে, সেই জঙ্গল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতি বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হত।

মানুষ কতদিন এ সব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাক্‌লায় চাক্‌লায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরি হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হল। কিন্তু হাতি-বেগার আর চলল না।

এখনও চৈতননগরে, হিঙুরকোণায় গেলে খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যায়। থুরথুরে বুড়ো যারা, তারা তুখ্যু করে বলে, সেকালে সবের খেতে আমরা লুকোচুরি খেলতাম; মাঠে এত ধান হত যে কাকপক্ষীরও অরুচি ধরত। গোয়ালে থাকত ষাট-সত্তরটা গোরু; নর্দমায় তুধ ঢালাই হত। আর এখন? এক ফোঁটা তুধের জন্যে পরের তুয়োরে হাত পাততে হয়।

একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। ও-অঞ্চলে যদি কখনও যাও, ওরা তোমাকে 'বাঙাল' বলবে। চটে যেয়ো না যেন। বাঙাল মানে বাঙালী। বাংলাদেশে থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি — তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে।

অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ!

ছাতির বদলে হাতি

নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক্ ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু শুধু একটা ছাতির বদলে এক নয়, দুই নয় একেবারে তিন বারোং ছত্রিশ বিঘে জমি — নাকের বদলে নরুন তো তার কাছে কিছুই নয়। বিশ্বাস না হয়, বেশ, একবার হালুয়াঘাট বন্দরে যেয়ো। সেখানে মনমোহন মহাজনের গদিতে গেলেই বুঝবে কী তেজ বন্ধকী-তেজারতির? মনমোহন মহাজন গত হয়েছেন অনেক দিন; কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।

পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হালুয়াঘাট বন্দরে গারো পাহাড়ের নিচের এক গাঁ থেকে সওদায় এসেছিল এক গারো চাষী। নাম তার চেংমান। এমন সময় দেও-দেবতা স্তম্ভিত দিক্‌পৃথিবী কম্পিত করে মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি ধরবার কোন লক্ষণই নেই।

এদিকে দিন তো হেলে, রাত তো টলে — বাড়ি ফেরার উপায়

কী? মনমোহন মহাজনের দোকানের ঝাঁপির নিচে চেংমান আশ্রয় নিয়েছিল।

হঠাৎ মহাজন যেন করুণার অবতার হয়ে উঠল। একেবারে খাস কলকাতা থেকে খরিদ করে আনা আনকোরা নতুন একটা ছাতা চেংমানের মাথার ওপর মেলে দিয়ে মনমোহন বলল : 'যা যা, ছাতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। নিজে ভিজিস্ তাতে কিছু নয়, কিন্তু এতগুলো পয়সার সওদা যে ভিজে পয়মাল হয়ে যাবে।'

মহাজনের দরদ হঠাৎ কিসে এত উথলে উঠল? চেংমান দোমনা হয়ে ভাবছে নেব কি নেব না। নিশ্চয় অনেক দাম। হাতে পয়সাও তো নেই।

'নগদ পয়সা নাই বা দিলে। যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হল। ওর জন্যে কিছু ভেবো না।' — মনমোহন ভরসা দেয়।

চেংমান ভাবল এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে মহাফূর্তিতে বাড়ির দিকে সে চলল। ছেলে পুলে বউ তার পথ চেয়ে বসে আছে। চেংমান গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

চেংমান ফি বার হাটে যায়। মনমোহনকে বলে, 'বাবু, পাওনাগণ্ডা মিটায়ে নেন।' মনমোহন ফি বারই বলে, 'আহা-হা অত তাড়া কিসের, সে দিওখ'ন পরে।' এমনি করে বছর, তারপর বছর যায়। ধার করে ছাতি কেনার কথা চেংমান ভুলেই গেল। হঠাৎ একদিন হাটবারে মনমোহন চেংমানকে পাকড়াও করে। '—কী বাছাধন, বড় যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাও।' মনমোহনের কথায় চেংমানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চেংমান বুঝতে পারে এবার সে ইঁদুর-কলে পড়েছে।

মনমোহন তার লাল খেরোয় বাঁধানো জাব্দা খাতা বার করে যা পাওনা হিসেব দেখাল, তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠল।

এই ক'বছরে চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতির দাম বাবদ সুদসমেত পাওনা হয়েছে হাজারখানেক টাকা! প্রায় একটা হাতির দাম।

বিশ্বাস করো, বানানো গল্প নয়! যদি যাও ও-অঞ্চলে, পাকাচুল প্রত্যেকটা ডালু-হাজং-গারো চাষী এর সাক্ষী দেবে।

ডালুদের গ্রাম কুমারগাঁতির নিবেদন সরকারের মুদিখানায় দু'দশ বছর বাকিতে মশলাপাতি কেনার জন্যে নিবেদনের ছেষট্টি বিঘে জমি মহাজন কুটিশ্বর সাহা এমনিভাবে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে। আরেক ধুরন্ধর মহাজন এক চাষীকে ধারে কোদাল দিয়ে পরে তার কাছ থেকে পনেরো বিঘে জমি মোচড় দিয়ে নিয়েছিল।

ও অঞ্চলের পঞ্চাশটা গ্রামে ডালুদের বাস। কথাবার্তায় পোশাক-পরিচ্ছদে হাজংদের সঙ্গে এদের খুব বেশী মিল। কে ডালু, কে হাজং বোঝাই যায় না। কিন্তু ডালুদের জিজ্ঞেস করো, ওরা বলবে—হাজংরা জাতে ছোট। হাজংরাও আবার ঠিক উল্টো বলবে।

ডালুরা বলে, সে-দিন আর নেই। আগে ছিল তারা অন্ধ বোকার জাত। পাহাড়ের নিচে যেদিন থেকে লাল নিশান খুঁটি গেড়েছে, সেই দিন থেকে তাদের চোখ ফুটেছে।

সে এক দিন ছিল বটে। শুধু মনমোহন মহাজন আর কুটিশ্বর সাহাই নয় — ছিল জোতদার আর তালুকদারের নিরঙ্কুশ শাসন। আর সেই সঙ্গে বৃটিশ সিংহের দাপট। সিংহ --যার ভাল নাম পশুরাজ।

জমিদারের খামারে জমির ধান তুলতে হবে। জমিদারের পাওনা মিটিয়ে তবে চাষী তার ঘরে ধান নিয়ে যেতে পারত। চুক্তির ধান তো বটেই, তার ওপর কর্জার ধান শোধ দিতে হত টাকায় এক মণ হিসেবে। তাছাড়া আছে হাজার রকমের বাজে আবওয়াব।

অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। যে-চাষী বুকের রক্ত জল করে এত কষ্টে ফসল ফলাল শেষটায় তাকে শুধু পালা হাতে করে ঘরে ফিরতে হত।

এ দিকে আর এক রকমের প্রথা আছে – নান্‌কার প্রথা। নান্‌কার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঁঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্ত হত। খাজনা দিতে না পারলে তহশীলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমোড়া করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নীলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত। মহাজনেরা কর্জা ধানে এক মণে দু'মণ সুদ আদায় করত।

কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুম্‌নাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষীরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলব না। ধান তারা তোলে নি। পুলিশ কাছারি কিছুতেই কিছু হয় নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।

আজ তারা গর্ব করে বলে, বন্দরের ভদ্রলোকেরা আজ আর আমাদের তুই-তুকারি করতে সাহস পায় না। 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে। থানায় চেয়ার ছেড়ে দেয় বসতে। আমরাও অনেক সভ্য হয়েছি। আগে বাপ-ছেলে একসঙ্গে বসে মদ খেত, এখন মদ খাওয়া সমাজের চোখে খুবই লজ্জার বিষয়।

হালবলদের অভাবে চাষআবাদের আজকাল বেজায় মুশকিল। এখানকার চাষীরা তাই সবায় মিলে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ওরা ছেলেমেয়েরা মিলে গান ধরে :

> শুনো শুনো বন্ধু গো ভায়া
> রোয়া লাগাইতে চলো গো এলা।

বন্ধুর জমিখানি দাহাকোণা
হাল জরিছে মৈষমেন।
হাল বো আছে
নি' উথি মাতি রে
কত বা লাগাবো নিতি নিতি।...

চলো বন্ধু! এখন রোয়া লাগাতে যাই। পাহাড়ের নিচে আমাদের জমি; হালের ভারে মোষের শিং নুয়ে পড়েছে। আমরা হাল বাইছি ভাই, আমরা হাল বাইছি। কিন্তু কঠিন মাটি উঠতে চায় না। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন যোগায় — ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?

দীপঙ্করের দেশে

সামনে বাবলা বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশা। শাদা বকের মত পাল উড়িয়ে নৌকো ছুটেছে সাঁই সাঁই। একতলা নিচু পাটের জমি গাঁয়ের রাস্তা থেকে গড়ান হয়ে নেমে গেছে দুই ঘাট বরাবর। --- দু'বছর আগের কথা। চোখ বুঁজলে আজও যেন সব দেখতে পাই। আসবার দিন স্টিমার থেকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি রানীনগরের এতিমখানা--রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে ঢেউখেলানো করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মত ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে। — কে আলি হোসেন না গৌরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

গিয়েছিলাম ঢাকার বিক্রমপুর পরগনায়। এই বিরাট পরগনাকে বলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা। বিক্রমপুরের মাটিতে মিশে

আছে অনেক দিনের ইতিহাস। এখানকার প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপে পাওয়া গেছে বহুকালের বিস্মৃত শিলালিপি। পুরনো দিনের সাক্ষী অনেক সায়র, অনেক বিল আজ বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। যাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দূর নেপাল থেকে সুদূরে শ্যামসুমাত্রা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল, সেই স্বনামধন্য দীপঙ্করের জন্মভূমি এই বিক্রমপুর।

···স্টিমার এসে থামল তারপাশায়। জেটি থেকে ডাঙা অনেকটা তফাতে। মাঝখানে সরু-সরু-তক্তা-জোড়া দেওয়া লম্বা নড়বড়ে পুল। মোটঘাট মাথায় নিয়ে পার হবার সময় মনে হয় বৈতরণী পার হচ্ছি। একরাশ লোকের ভারে পুল ভাঙো-ভাঙো হয়, নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। কালো কালো ঢেউগুলো সব মুখে ফেনা তুলে গজরাচ্ছে। কুমীরের মত হাঁ করে আছে, জিভ দিয়ে যেন তাদের জল গড়াচ্ছে। সরু নড়বড়ে পুলের ওপরকার মানুষগুলোর পিছু নিতে নিতে তারা যেন বিড় বিড় করে বলছে ---ফস্‌কালেই হয়! ফসকালেই হয়!

টলতে টলতে পড়ি কি মরি করতে করতে কোনরকমে তো প্রাণ নিয়ে ডাঙায় এসে উঠলাম। উঠেছি কি অমনি সপাং সপাং চাবুকের মত এক ঝলক বালি এসে চোখমুখ কানা করে দিল। সারাদিন ঠায় রোদ্দুরে পুড়ে মেজাজ তাদের সব তিরিক্ষি হয়ে আছে। যেখানে লাগে ফোস্কা পড়িয়ে দেয়।

নদীর পাড়ে গোটাকয়েক চা-জলখাবারের দোকান। চারিদিকে আর জনমনিষ্যি নেই। চায়ের গ্লাসে গলা পর্যন্ত থিক্ থিক্ করছে বালি। দোকানের চালাগুলো নতুন। ঘাট ছিল আগে আরও ওপাশে, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। নদী ভাঙতে ভাঙতে চলেছে; সামনেই নদীর ঠিক বুকের ওপর অস্পষ্ট নতুন চর জেগে উঠছে।

যাব মেদিনীমণ্ডল। উত্তরে অনেকটা রাস্তা। যতদূর নজর যায় লোক চোখে পড়ে না। গ্রামগুলো খাঁ খাঁ করছে।

আকালের বছরে সব শেষ হয়ে গেছে। কামারবাড়ীতে গ্রামের দু'একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। পোড়াকাঠের মত চেহারা — সারা গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে খোসপাচড়া।

বিপিন কর্মকার দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে হাপুস নয়নে কাঁদে। ঘরের যথাসর্বস্ব বেচে দিয়েও ডাগর ছেলেটাকে সে বাঁচাতে পারে নি। হাতুড়ি, নেহাই জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে বন্দরের মহাজনের কাছে। শুধু হাপরটা আজও পারে নি — তাতে লোহা না পুড়ুক, কল্কের আগুন ধরানো চলে। গাঁয়ের পুরুতঠাকুরও কান্নাকাটি করে; সব গিয়ে শুধু পৈতেগাছটা আছে। বারো মাসের তেরো পার্বণের দিন আর নেই। যতদিন গাঁয়ে বসন্ত আছে, শীতলা মার পুজো চলবে। কিন্তু তাও আবার উড়ো খৈ গোবিন্দায় নম। চারগণ্ডা পয়সাও দক্ষিণা পাওয়া যায় না। ঠাকুর মশাই দুখ্যু করে বলে, বামুন হয়ে জন্মেছি; না করতে পারি চাষের কাজ, না করতে পারি কুলিগিরি। আমাদের সব দিক দিয়েই মরণ।

গাঁয়ের অর্ধেক লোক দেশত্যাগী হয়েছে। কে কোথায় গেছে কেউ জানে না। যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তারাও যাব যাব করছে। ঘরে মানুষ হয় জ্বরে কাতরাচ্ছে, না হয় তো খালি কোলে মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। মুসলমানপাড়ায় ঢুকলে দেখা যায় বাড়ির উঠোনগুলো উঁচু ঢিবি হয়ে আছে। যারা মরেছে তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে কবর দেবারও সামর্থ্য ছিল না কারো।

জেলেপাড়া, যুগীপাড়া সাফ হয়ে গেছে। গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটতে গা ছমছম করে। বাড়িতে বাড়িতে আর সন্ধ্যে জ্বলে না, শাঁখও বাজে না। রাত্তিরে ঝড় উঠলে হারিকেন হাতে ছেলের

দল আমবাগানে আর ছুটে যায় না। পাকা আম মাটিতে পড়ে পচে যাচ্ছে। বাপের জন্মে কেউ এমন দেখেনি।

ঋষিপাড়ায় আর ডুগ্ ডুগ্ বাজনা বাজে না। ভাগাড়ে গোরু পড়ে না — চামড়া পাবে কোত্থেকে? হালবলদ বেচে দিয়ে চাষীরা বিশ টাকায় দশ সের চালও ঘরে আনতে পারেনি।

সব গাঁয়ে সব লোকের এক দশা। তেমনি আবার গাঁয়ের দু'চার জন লোক এই দুর্ভিক্ষে তাদের ভোল ফিরিয়েছে। যেমন আমতলার মৈজুদ্দি ব্যাপারী। টঙ্গিবাড়ী বাজারে ছিল তার ভুষি-মালের দোকান। চালের কারবার করে দু দিনে সে ফেঁপে উঠল। দারোগা-পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে বস্তা বস্তা চাল এনে মৈজুদ্দি মজুত করেছিল। ভাতের অভাবে লোক যখন বাজারের রাস্তায় এসে মাছির মত মরছিল, তখন মৈজুদ্দি সেই চাল বেচেছে আশী টাকা মণ দরে। গাঁয়ের লোক জলের দামে জমি বেচেছে, সেই জমি কিনে মৈজুদ্দি হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। মৈজুদ্দির টিনের চালা ভেঙে পাকা দালান-কোঠা উঠেছে।

লৌহজঙ্গ বন্দরের ব্যাপারীরা ভারি মুশকিলে পড়েছিল। দিঘলীর খাল যেখানটায় পদ্মায় গিয়ে পড়েছে, তারই মুখে দোকান-পাট, গুদাম আর মহাজনদের গদি। যত লোক না খেয়ে রোগে হাত পা ফুলে মরেছে, তাদের টেনে টেনে খালের জলে ফেলা হয়েছে। এদিকে স্তূপাকার শবদেহে খালের মুখ পর্যন্ত বুঁজে গিয়েছে। দুর্গন্ধে বন্দরে টেকা দায়। বন্দরের মহাজনরা মহা ফাঁপরে পড়ল। এ যেন লোকগুলো মরে গিয়ে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে মাইনে-করা ডোম আনতে হল খাল থেকে মড়া ফেলার জন্যে। মহাজনদের গাঁটের কড়ি বেশ কিছু খরচ করতে হল। কিন্তু মানুষ মেরে যা লাভ তারা

করেছে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। মানুষ মেরে তারা লাভ করেছে মাথাপিছু হাজার টাকা, আর প্রত্যেকটা মড়া ফেলার জন্যে তাদের খরচ হয়েছে আট আনা কি এক টাকা।

তাছাড়াও আকালের মরশুমে কত রকমের ভেক, কত রকমের বুজরুকির সৃষ্টি হয়েছে। হাঁসাইলের বিক্রমাদিত্য পর্বত। নাম শুনলে হাসি পায়। লোকটা ছিল হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগল, হঠাৎ দেখা গেল সে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে গাছতলায় বসেছে। লোকজনকে দিচ্ছে স্বপ্নাদ্য ওষুধ। ওষুধ না ছাই! কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রোগাপট্‌কা লোকটার গায়ে মাংস লেগেছে। যখন মড়ক থেমে গেল, তখন দেখা গেল পর্বত আবার পুনর্মূষিক হয়েছে, গেরুয়া ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরেছে।

রানীনগর গ্রামে পৌঁছুতেই ছু'একবার বিদ্যুৎ চমকিয়ে আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ল। সামনে টিনের একটা আটচালা। লেখা রয়েছে: রানীনগর এতিমখানা। যাঁর ওপর এতিমখানা চালানোর ভার তিনি সমাদর করে ঘরে বসালেন। ভদ্রলোকের নাম আবছুর রহমান। লোকে বলে, রহমান মাস্টার। লেখাপড়া ইংরিজি-বাংলা ভালই জানেন।

গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলে আর পোস্টাপিসে ছুজায়গাতেই এক সঙ্গে তিনি মাস্টারি করতেন। সেই থেকে সবাই তাঁকে রহমান মাস্টার বলে ডাকে। মুখে সর্বদা একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

রহমান মাস্টারের কাছে শুনলাম, ও-অঞ্চলের ছুর্দশার কথা। বিক্রমপুরের অধিকাংশ লোকই থাকে বাইরে বাইরে। চাকরি করে, ব্যবসা করে আর মনি অর্ডারে বাড়িতে টাকা পাঠায়। এত

মনি অর্ডার আর কোন দেশে আসে না। তবু চিরকাল বিক্রমপুরের নাম ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। ছুটির সময় গ্রামগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত। আজ ফুটবল, কাল নৌকা-বাইচ — খুব আনন্দে দিন কাটত। দু'তিন মাস জলে জলে কাটিয়ে জেলেরা ফিরত ঘরে। দেশবিদেশের গল্পে জমে উঠত আসর। দুর্ভিক্ষ এসে সব চুরমার করে দিয়েছে। চালের দাম উঠেছে চল্লিশ থেকে আশী টাকায়। নাতিপুতি-বৌ নিয়ে বিধবা মা রাস্তার দিকে হা-পিত্যেশে চেয়ে আছেন কবে মনি অর্ডারে ছেলের কাছ থেকে টাকা আসবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত পিওন এল — কিন্তু টাকা নিয়ে নয়, ছেলের মৃত্যুর খবর নিয়ে। এমনি করে শেষ হয়ে গেছে কত সংসার। সব কিছু গিয়ে শুধু ভিটেমাটিতে এসে ঠেকেছে।

নতুন লোক দেখে এতিমখানার ছেলেমেয়েরা পড়ার বই রেখে দিয়ে ছুটে আসে। আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, শুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম — একে একে আলাপ হয়। দুর্ভিক্ষে বাপমা মরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সৃষ্টিছাড়া সংসার গড়ে উঠেছে। সকলের বড় আলি হোসেন। বড় ভাইয়ের মত সকলকে সে আগলায়।

আলি হোসেনের বাড়ি ত্রিপুরায়। চাঁদপুরে স্টিমারে উঠে ভিক্ষে করছিল। স্টিমার ছেড়ে দেওয়ায় আর নামতে পারেনি। একেবারে নেমেছিল তারপাশায়। সেখান থেকে গিয়েছিল মাওয়ার বাজারে। বাজারের লঙ্গরখানায় একবেলা খিচুড়ি খেত আর রাত্তিরে পড়ে থাকত দোকানের দাওয়ায়। রাত্তিরে ঘুম হত না ঠাণ্ডায়। গায়ের চামড়া ফেটে রক্ত বেরোত। তার ওপর মাছি বসে বসে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আলি হোসেনকে তাই বাজারের লোকজন পাঠিয়েছিল রিলিফ হাসপাতালে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে রানীনগরের এতিমখানায়। বাপ-মার

কথা জিজ্ঞেস করলে দশ বছরের ছেলে আলি হোসেনের চোখগুলো ছোট ছোট হয়ে আসে ; আর বোধহয় কান্না চাপার জন্যেই তিন বছরের ছোট্ট বোন হরিদাসীকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। আলি হোসেনের বাপ মা ভাইবোন নিজের বলতে কেউই নেই।

ছোট হলে কি হয়, বাপ-মার কথা গৌরাঙ্গর স্পষ্ট মনে আছে। গৌরাঙ্গদের বাড়ি পাবনা জেলায়। বাপ তার ঘরামির কাজ করত। একবার উঁচু চালের মটকা বাঁধতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল গৌরাঙ্গর বাবা। তবু খোঁড়া পা নিয়েই আবার কাজে লেগেছিল। কিন্তু গাঁয়ে আর কাজ পাওয়া গেল না। তারপর চালের দাম হল চল্লিশ টাকা। নস্করবা গাঁয়ের বড় জোতদার। তাদের পা ধরে গৌরাঙ্গর বাবা কত কাঁদাকাটা করল — তুসের ধানও তারা কর্জ দিল না। তারপর থালাবাটি সব বিক্রি করেও যখন আর বাঁচা গেল না, তখন গৌরাঙ্গর বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। গৌরাঙ্গর ছোট বোনটাও তুদিন পরে মারা গেল। গৌরাঙ্গর মা ক'দিন খুব বুক চাপড়ে কাঁদাকাটা করল, তারপর কোথায় যে চলে গেল গৌরাঙ্গ আর খুঁজে পেল না। সিরাজগঞ্জের ঘাটে গৌরাঙ্গ ভিক্ষে করছিল, তাই দেখে এক ভদ্রলোক তাকে নিয়ে আসে মাওয়ার বাজারে।

আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানু তুই বোন। বড় আজিমুন্নেসার মুখে আগুনে-পোড়া দাগ। আগুনে পোড়ার কথা বললে এখনও আজিমুন্নেসার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আজিমুন্নেসার বাপ সলিমুল্লা ছিল কুমারভোগের তাঁতী। অভাবে তাঁত বেচতে হল সলিমুল্লাকে। শেষ পর্যন্ত শোথ হয়ে সলিমুল্লা মারা গেল। আজিমুন্নেসার মা নিরুপায় হয়ে আবার বিয়ে করল — কিন্তু নতুন সংসারে মেয়ে তুটির আর ঠাঁই হল না। আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় দয়া করে

তাদের আশ্রয় দিল। কিন্তু অভাব কার সংসারে নেই! তাদের এমন হল যে আর দিন চলে না। মনুষ্যত্ব পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদিন আজিমুন্নেসাকে ক্ষিধেয় কাঁদতে দেখে বাড়ির কর্তা মেয়েটার মুখ উনুনের মুখে চেপে ধরল। মনগুলো সব পাষাণ হয়ে গেছে। শেষকালে সুকুরবানুর চীৎকারে পাড়ার লোক ছুটে এসে আজিমুন্নেসাকে বাঁচাল।

এতিমখানার ছোট ঘরটার মধ্যে এমনি দুঃখের কাহিনী যেন জমাট বেঁধে আছে।

মজিদকে জিজ্ঞেস করলাম, বড় হয়ে তুমি কী করবে? মজিদের চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে; হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়লোকদের শেষ করবো।

— কথাটা বোধ হয় রহমান মাস্টারের শেখানো।

রানীনগরের এতিমখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাত ফরসা হবার আগেই। আলি হোসেন আর গৌরাঙ্গ, মজিদ আর রাধাশ্যাম, আমিনা আর হরিদাসী সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই আমাকে খুঁজবে জানি। ঘণ্টা কয়েকের মাত্র আলাপ। তারই মধ্যে ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছে।

কিন্তু ওদের ঘুম থেকে তুলে বিদায় নেব, সে সাহসও নেই। যাচ্ছি শুনলে সুকুরবানু যদি কাঁদে? বলা যায় না, যদি আমার চোখই ঝাপসা হয়ে ওঠে?—তাই বিদায় না নিয়েই বোঁচকা-বুচকি কাঁধে ফেলে রওনা হই। হাত ধরে বাঁশের সরু সাঁকোটা পার করে দিলেন রহমান মাস্টার। তারপর মুঠো-করা হাত ওপরের দিকে তুলে কী একটা কথা বলতে চাইলেন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হতে দেখলাম, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোল না। হঠাৎ পেছন ফিরে রানীনগরের রাস্তা-বরাবর মাটিতে চোখ রেখে হন্ হন্ করে হাঁটতে

লাগলেন রহমান মাস্টার। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ালাম। বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র মানুষের ভালবাসা।

আবার পথ-চলা শুরু হয়। ঘোড়দৌড়ের বাজার পেরিয়ে লৌহজঙ্গ। মুন্সীগঞ্জ ঘাট থেকে সোনারং আর টঙ্গিবাড়ি, কমলাঘাট আর বজ্রযোগিনী।

রাস্তার দুপাশের গাছে অজস্র পাকা গাব। পাতা দেখা যাচ্ছে না গাছের।

ঘাট থেকে ফিরছিল এক বুড়ো। হঠাৎ সে গাছগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, দেখেছেন? - - একটু অবাক হয়ে গেলাম। লোকটার প্রশ্ন শুনে নয়, প্রশ্নের সঙ্গে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে দেখে। বেশ তো লাল টুকটুকে ফল ধরেছে গাছে। তাতে মন খারাপ করবার কী আছে?

আছে। কেননা এ দৃশ্য নাকি এ অঞ্চলে তিন কালে কেউ দেখেনি। বর্ষার মরশুম শুরু হয়-হয়। নৌকো মেরামতের এই হচ্ছে সময়। অন্য অন্য বার এর ঢের আগেই নৌকো সারানোর ধুম পড়ে যায়। এ-সময় গাছে গাব পাকতে পায় না। কারণ গাবের আঠা দিয়ে না জুড়লে নৌকো মেরামতই হয় না। কিন্তু গাব রইল গাছে। নৌকো সারবে কিসে?

বুড়ো বলে, আজ কারো নৌকোই নেই, তার আবার সারবে। জ্বালানির অভাবে নৌকোর কাঠ সব চেলা করে লোকে মড়া পুড়িয়েছে। আর আজ তারা আস্‌মানে মেঘের চিড়িক দেখে আর কপাল চাপড়ায়। কী করে তারা এ-বর্ষা কাটাবে? দুদিন পরেই জলে থৈথৈ করবে গোটা তল্লাট। নৌকো না হলে হাটে-বাজারে যাওয়া দূরের কথা, পাড়াপড়শীর বাড়িতে যে একটু দুঃখের গল্প বলতে যাবে, সে-উপায়ও থাকবে না।

বুড়ো যে-গাঁয়ে থাকে, নাম তার নেত্রাবতী। গাঁয়ের রাস্তায়

চলতে চলতে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, শুনতে পাচ্ছেন? কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম। একটা ঝিঁঝিঁ অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চলেছে। মাথা খারাপ নাকি বুড়োটার? পাগলের পাল্লায় পড়ে শেষটায় বেঘোরে মারা পড়ব নাকি?

এতক্ষণ ভাল করে তাকাইনি। বসন্তে পোড়-খাওয়া ঘা-দগদগে বীভৎস মুখ বুড়োটার। মাথার চুল সব উঠে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা দুটো চোখ কোটরের মধ্যে ঢোকানো। এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা পড়ে কি পড়ে না বোঝা যায় না।

একটা পা মাটিতে আছড়িয়ে বুড়ো বলে, এই মাটি কাঁপত আগে হাতুড়ি আর নেহাইয়ের গম্‌গম্ আওয়াজে। মিস্ত্রিপাড়ায় ঢুকতে আজ গা ছম্ ছম্ করে। পোড়ো ভিটেগুলোর ওপর দিনদুপুরে শেয়াল ডাকে।

বুড়ো আমাকে ভেবেছিল রিলিফের লোক। একটু পরে ভুল যখন তার ভেঙে গেল, তখন একটু গরম হয়েই বলল—এসেছেন কেন এই পোড়া দেশে? মানুষ মরে ফৌত হয়ে গেছে তাই দেখতে?

আমার তখন এমন অবস্থা, পালাতে পারলে বাঁচি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা এই বুড়োকে কী করে আমি বোঝাই যে, কঙ্কালের ছবি এঁকে আমি বাঁচা আর আধ-বাঁচা মানুষগুলোকে জাগাব? দানছত্রের ক্ষুদকুঁড়ো নিয়ে আসিনি আমি। আমি এসেছি পাথরে পাথরে চক্‌মকি ঠুকে শুক্‌নো পাতায় আগুন জ্বালাতে। কেমন করে বলি?

ডান পাশে কচা গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা অজানা গাঁয়ের রাস্তা। সেদিকে পা বাড়াতেই বুড়ো হাঁ হাঁ করে উঠল—ও গাঁয়ে যাবেন না।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। আচ্ছা লোক তো? জমিদারি নাকি ওর যে, বারণ করবে?

চটেছি বুঝতে পেরে বুড়ো নিজের থেকেই বলল — দেখুন ও-গাঁয়ে মেয়েদের পরবার কিছুই নেই। খাটতে তো হয়। তাই দিনের বেলায় ঘরেও বসে থাকতে পারে না। আপনি গেলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে।

শুনে থ' হয়ে গেলাম। কোন্ দেশে আছি আমরা? কোন্ শতাব্দী এটা? চিন্তার মধ্যে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

কাটা একটা আঙুল শুধু চোখের ওপর ভেসে উঠল — যে-আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ বেনের দল। যে-আঙুলে বোনা হত একদিন দুনিয়া-জয়-করা ঢাকাই মসলিন, সেই কাটা আঙুলের রক্ত আজও বন্ধ হয় নি। চোখ বুঁজে সূর্যের দিকে তাকালাম, সেই রক্ত। আজও ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে থমকে আছে ফোঁটা ফোঁটা সেই রক্ত! দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়েছে যে-দুঃশাসন, তার রক্ত কবে ফিন্কি দিয়ে বেরোবে?

আমতলীর বাজারে আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

বাজারের পাশ দিয়ে গেছে খাল-বরাবর রাস্তা। অমাবস্যা কিনা জানি না। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একদল ছায়ামূর্তি মাথায় করে মোট বয়ে তুলে দিচ্ছে খালের নৌকোয়।

বাজারের এক ফড়ে যাচ্ছিল আমাকে সোনারঙের রাস্তা দেখাতে। সে বলল, দেখলেন ব্যাপারখানা?

পরে সে যা বলল তাতে দেখলাম অবাক হবার কিছু নেই। সেন আর গুপ্ত, দত্ত আর মিত্তির বাড়ির মেয়েরা অন্ধকারে বেরিয়েছে মাথায় করে মোট বইতে। পেটে আগুন জ্বললেও

দিনের বেলায় তাদের বাড়ির বাইরে যাবার জো নেই। তাতে ভদ্রঘরের বদনাম হবার ভয় আছে। কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে তো ইতরভদ্র সবাই সমান। তা ছাড়া দেখছেই বা কে?

একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করা হয় নি — এত যাদের চক্ষুলজ্জা, শুক্ল পক্ষে তারা কী করে?

·

টঙ্গিবাড়ি, সোনারং, বজ্রযোগিনী — যেখানেই যাই সেই একই কাহিনী।

শুধু মাধবের মা র কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। এতিমখানার বাঁশের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে — ওপারে মাধবের মা, এপারে মাধব। মা র কোলে যাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে মাধব। কিছুতেই যেতে দেবেন না রহমান মাস্টার। মাধবের মার সারা গায়ে বিষাক্ত ঘা।

কতদিন পর মাধব দেখছে তার মাকে। কোথায় ছিল এতদিন? না খেয়ে সে যে মরে যাচ্ছিল! কিন্তু এ কোন মাকে সে দেখছে? গায়ের রং এমন কালো হয়ে গেল কেমন করে? গলে গেছে যেন সুন্দর মুখটা। পোড়া কাঠের মত মার এ চেহারা তো সে কোনদিন দেখেনি। রহমান মাস্টার, দাও না আমাকে একবার মার কাছে যেতে!

যেমন ভালবাসে, তেমনি হৃদয়হীন রহমান মাস্টার। কেঁদে মরে গেলেও রুগ্ন মার কাছে ছেলেকে যেতে দেবেন না তিনি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তাঁর, টলাবে সাধ্য কার?

মা যেদিন চলে যায়, এক বছর আগের সেই দিনটার কথা মাধবের একটু একটু মনে আছে। দুদিন উপোস করার পর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাধব। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে মা নেই।

এ-পাড়া ও-পাড়া কোথাও তার মা নেই। তারপর গাঁয়ের এক আত্মীয়-বাড়িতে গিয়ে মাধব উঠেছিল। মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে পাড়ার লোক আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিত। সেই আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ত তখন মাধবের মনে হত দুঃখিনী মা তার কাঁদছে। বর্ষায় মনটা ভারি খারাপ হয়ে যেত মাধবের।

যে-বাড়িতে জায়গা পেয়েছিল মাধব, সেই বাড়িতে লোকগুলো সব হঠাৎ হাত-পা ফুলে মরে গেল। তারপর না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মাধব এসে জুটল একদিন মেদিনীমণ্ডলের লঙ্গরখানায়। অনেকদিন পর বাজারের এক দোকানদার তাকে নিয়ে আসে এই এতিমখানায়।

এতদিন পর মার বুঝি মনে পড়ল? আকাশ থেকে নেমে আসার সময় হল? আর আকাশে যখন গেলই, তখন যাবার সময় একবার বলে যেতে পারত না কি? এ এক বছর কী কষ্টে গেছে তার, মা কি তার খবর পায় নি? দেখে নি কি আকাশ থেকে? — মাধব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মাধবকে দেখে মাধবের মারও বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। দুদিনের চেষ্টাতেও একমুঠো চাল যোগাড় করে মাধবকে খাওয়াতে না পেরে এক বছর আগে ভোরে উঠে নদীতে ডুবে মরতে গিয়েছিল মাধবের মা। কিন্তু নদীর কনকনে জলে ডুবে মরতে ভয় পেয়েছিল মাধবের মা। ছুটে চলে গিয়েছিল তাই ঘোড়দৌড়ের বাজারে। এক বছর ধরে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে শুধু একমাত্র কামনা ছিল মাধবের মার — মাধব আমার বেঁচে থাক।

সেই মাধব বেঁচে আছে রানীনগরের এতিমখানায় — এ খবর শুনে মাধবের মা ছুটে এসেছিল মাধবকে একবার শেষ দেখা দেখতে। মাথায় একটু বড় হয়েছে মাধব! বেড়ার ওপার থেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে কী ইচ্ছেই না হচ্ছিল মাধবের মার।

কিন্তু সর্বাঙ্গ যে তার গলে গলে খসে পড়ছে। ছেলের অকল্যাণের ভয়ে মনকে পাষাণ করে নিল মাধবের মা। তারপর একটা হাত দিয়ে দূর থেকে মাধবকে চুমো খেয়ে মাধবের মা অন্ধকারে আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরে শুনলাম মাধবেব মা ঘোড়দৌড়ের বাজারে আর ফিরে যায়নি। সোজা চলে গিয়েছিল যেদিকে পদ্মা সেইদিকে। এক বছর আগের চেয়েও নদীর জল এবার ঢের বেশী কন্‌কনে হলেও, ঠাণ্ডা জলের নিচে তলিয়ে যেতে মাধবের মার নাকি এবার একটুও ভয় করেনি।

ঢাকা থেকে ফিরে আসছি স্টিমারে। ধূ ধূ করছে নদী। নদীর নাম কীর্তিনাশা। শাদা বকের মত পাল উড়িয়ে নৌকো ছুটছে সাঁই সাঁই করে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সব নৌকোর মাঝি। তাদের বাপ-দাদারা মরেছে পঞ্চাশের আকালে; সামনে বাবলা-বনের ভেতর দিয়ে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি রানীনগরের এতিমখানা। রোদ্দুরে ঝিক্‌মিক করছে করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মত ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে -- কে আলি হোসেন না গৌরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

জলের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল কী ওটা? মাধবের মা না তো?

কতদিন আগের কথা। চোখ বুঁজলে আজও যেন সব দেখতে পাই।

বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ

সাতকাহনিয়া, সাগরপুতুল, সাগরা, কোটালঘোষ, কাঁটাটিকুরি, আয়মা, দর্শিনী, বনবাহিনী — গ্রামগুলোর ভারি সুন্দর নাম। দূর থেকে মনে হয়, দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ — সোনার ধান ওড়নার মত হাওয়ায় উড়ছে। দূরে রোদ্দুরে চিক্ চিক্ করছে জল। কাছে যাও সব মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। ধান নয়, নিষ্ফল বেনাবন ; জলের চিহ্ন নেই, তৃষিত বালুকণা। ফসলের কথা জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের মানুষ মাঠ থেকে মুঠো মুঠো বালি তুলে দেখিয়ে দেবে — মুখে একটা কথাও বলবে না।

স্টেশন থেকে নেমেই একটা ছোট্ট জনপদ। কোঠাবাড়ির পাঁচিলগুলোতে জলের আঁচড় দেখিয়ে একজন বলল, ওটা বন্যার

দাগ। দু-মানুষ সমান উঁচু। বর্ষায় এ-অঞ্চলের বাড়িঘর সব ডুবে যায়। মানুষেরা আশ্রয় নেয় কোঠাবাড়ির ছাদে আর খড়োঘড়ের মট্‌কায়। চারিদিকে থৈ থৈ করে জল।

বেনাবনের ভেতর দিয়ে আলে আলে রাস্তা! সাবধানে যেতে হয় — ক্ষুরের মত ধারালো ঘাস পায়ের পাতা কেটে বসে। ঘুপ্‌চির মধ্যে হুল্ ফুটিয়ে দেয় বিছুটির পাতা। তারপর মাঠ। ধূ ধূ করছে বালি। দুপাশে তাকালে দেখা যায় পোড়োবাড়ির ভিটে, ভাঙা মন্দির — ইট ফুঁড়ে বট-অশথের গাছ গজিয়েছে। মাঠের মধ্যে বড় বড় খানাখন্দ।

রাস্তাঘাটে মানুষজন চোখেই পড়ে না।

পো গ্রামে ঢুকতেই ময়রাদের পাড়া। বাঁদিকে মস্ত বড় একটা বাড়ি। শুনলাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়েছে — বংশে বাতি দেবারও আর কেউ নেই। দিনের বেলা তবু গা ছম্ ছম্ করে!

যে-লোকটার কাছ থেকে ময়রাপাড়ার খবর পেলাম, নাম তার মুক্তিপদ রুজ। জাতে সেও ময়রা। এককালে গাঁয়ে দোকান ছিল, এখন সে মাঝে মাঝে পরের দোকানে চাকরি নেয়। আর এ-গাঁয়ে যখন মেলা বসে তখন দোকান দেয়। ময়রার ব্যবসা ছেড়েছে সে আজ পাঁচ-ছ বছর। পাঁচ-ছ বিঘে জমি ছিল তার, আজ সেখানে শুধু কেশোর বন; বালিতে চাষ করা অসম্ভব। ফসল হয় না, তবু ফি বছর জমির খাজনা গুনতে হয়।

গ্রামে ঢুকে দুশো হাতের মধ্যে ছ'সাতটা পোড়ো বাড়ি দেখলাম — সবাই ম্যালেরিয়ায় মরেছে।

অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও নাকি বর্ধমানের এ-সব অঞ্চলে লোকে হাওয়া বদলাতে আসত।

গাঁয়ের বৃদ্ধ ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হল। একটা শানবাঁধানো বুড়ো বটের ছায়ায় বসে তিনি পুরোনো দিনের গল্প শোনালেন। কী সুখেই না ছিল এখানকার মানুষ। সত্যিই ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গরু ছিল। বুড়ো বট তার সাক্ষী। কাঙালী-ভোজন করাতে হলে অন্য জেলায় ছুটতে হত — এ-অঞ্চলে কোন কাঙালী মিলত না।

আজ কেন যে এমন হল, তা এখানকার শিশুরা পর্যন্ত জানে। বললেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অজয় নদের দিকে। হিংস্র পার্বত্য নদী অজয়। ছোট-নাগপুরের পাহাড়ে তার উৎস। বর্ষা ছাড়া যে-কোন সময় যাও, দেখবে ভারি নিরীহ নির্জীব মূর্তি। এর গৈরিক জলে আছে পাথুরে দেশের পলি — যে পলিতে দেদার ফসল ফলে। বর্ষায় উদ্দাম হয়ে ওঠে এই নদী। বন্য হস্তীর মত বাঁধ ভেঙে মাঠে-মাঠে শুরু হয় ধ্বংসের অভিযান — পায়ে পায়ে গুঁড়িয়ে যায় ফসল-ভিটে-মাটি। তারপর শান্ত হয় নদী। খেতের জল শুকোয়, কিন্তু ক্ষত আর শুকোয় না। মাঠ হাঁ হয়ে থাকে বড় বড় গহ্বরে। স্বর্ণপ্রসূ মাটির ওপর স্তূপাকার হয় বন্ধ্যা বালি।

তাই চল্লিশ বছর ধরে একলক্ষ বিঘেরও বেশী জমি অনাবাদী পড়ে আছে। ন-টা ইউনিয়নের দেড়শোরও বেশী গ্রাম, প্রায় একলক্ষ মানুষের খেত-খামার, ঘরবাড়ি বারবার বন্যায় ভেসে যায়।

পশ্চিমে সাতকাহনিয়া থেকে পুবে সাগিরা পর্যন্ত একটানা চল্লিশ মাইল অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ। এটা যেন অজয় অঞ্চলের ভাগ্যরেখা। যেখানে চিড় খাবে, সেই পথেই সর্বনাশ। এর মধ্যে সাতকাহনিয়া থেকে সাগরপুতুল পর্যন্ত বাঁধটুকুই মাত্র সরকারী তদারকের মধ্যে পড়ে। এই অংশটুকুর মধ্যে বাঁধ যদি কোথাও ভাঙে, মেরামতের ভার সরকারের। সরকারের দরদ মানুষের জন্যে

নয়, রেল-লাইনের কিছু না হলেই হল। বাঁধের বাকি অংশ ভাঙলেও, হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মরলেও সরকারের যায় আসে না।

বাঁধের যে জায়গাগুলো নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাকে বলে হানা। সাগরপুতুল থেকে সাগিরা পর্যন্ত চার-চারটে হানার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো বাঁধতে না পারলে গোটা অজয় অঞ্চল ছারখার হয়ে যাবে।

তাই অজয় অঞ্চলের মানুষ বছরের পর বছর ধরে হানা বেঁধে দেবার জন্যে সেচ বিভাগের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে এসেছে। কোনই ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তারা গ্রামের সমস্ত মানুষকে ডেকে নিজেরা তিরিশ হাজার টাকা তুলে বাঁধ মেরামত করল। অনেকেই বিনা মজুরিতে এসে খেটে দিল, গাঁয়ের লোক চাঁদা তুলে তাদের খাওয়াল। সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা।

কিন্তু এবার হানা শুধু একটা নয়। আর এতগুলো হানা ভরাট করে বাঁধ বাঁধতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার। তাই সরকারকে রাজী করাতেই হবে। গ্রামে গ্রামে চলল মিটিং, শহরে দল বেঁধে গিয়ে হাকিম আর উজিরদের ঘেরাও করা হল। শেষ পর্যন্ত বর্ষার ঠিক মুখে সরকারকে রাজী করানো গেল।

আর কয়েকদিনের মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ করতে না পারলে বন্যায় আবার সব ভেসে যাবে। গাঁয়ের লোক হাপিত্যেশ করে আছে কবে ঠিকেদার আসবে, বাঁধের কাজ শুরু হবে।

শেষ পর্যন্ত দলবল নিয়ে একদিন ঠিকেদার এল পুরুচার হানা দেখতে। ঠিকেদার অবাঙালী, সম্ভবত মাড়োয়ারী। খবর পেয়ে ঠিকেদারের তাঁবুর সামনে দু-পাঁচটা গ্রামের হাজার হাজার লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে এল।

ঠিকেদার তাদের জিজ্ঞেস করল, 'বাঁধ কিস্‌কো বোলা যাতা হ্যায় ?'

শুনে তো সকলের চক্ষুস্থির ! যে-লোক বাঁধ কাকে বলে জানে না, সে এসেছে বাঁধ বাঁধতে। বাঁধে হাত দেবার আগে গাঁয়ের লোক মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিন্তু তীরে এসে যাতে তরী না ডোবে, তার জন্যে সবাই কোমর বেঁধে লাগল। বাঁধ নিজেদের চেষ্টাতেই তুলতে হবে।

পুরুচার গ্রামে এসে দেখি যেন কুরুক্ষেত্র। গ্রামের মধ্যে আর বাঁধের ধারে অসংখ্য শিবির — বেনাঘাসের ছাউনি-দেওয়া বাঁশের টোল। বিগল্ আর ব্যাণ্ড বাজছে — বেলুটি থেকে এসেছে ব্যাণ্ডের পার্টি। সাঁওতাল, বাগ্দী, বাউড়ী — অসংখ্য লোক কোদাল হাতে করে মাটি কাটছে। মেয়েরা ঝুড়ি হাতে করে লাইনবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। মাটির চাপে চাপে উঁচু হয়ে উঠছে বাঁধ। উঁচু হবে চার মানুষ সমান।

বন্যার দেশ বর্ধমান। বছর তিন-চার আগের এক বন্যার কথা মনে পড়ে গেল। সেবার ক্ষেপেছিল অজয় নয়, দামোদর। বর্ধমান শহর থেকে মাইল দশেক উত্তরে। জি-টি রোডের ওপরে দাঁড়ালেও পায়ের গোড়ালি ডুবে যায়। আশপাশের নিচু জমিতে খড়ের চালাগুলো সব জলের নিচে।

সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায়।

যেতে হবে আরও মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে হানার মুখে। মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক। তিনগুণ চারগুণ

ভাড়া। পকেটে আমাদের যা রেস্ত — তাতে শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না।

এমন সময় গেরুয়া বসনে দেখা দিলেন এক উদ্ধারকর্তা। সঙ্গে তাঁর একপাল চেলাচামণ্ডা। হাতে তাদের প্রকাণ্ড এক ফেস্টুন। তাতে কোন্ এক বৈষ্ণব মিশনের নাম লেখা। বাবাজীকে বেশ একটা প্রমাণ সাইজের প্রণাম জানিয়ে শরদীশ ডাক্তার বললেন, আমাদের উদ্ধার করুন।

মিশনের দু-দুটো নৌকা আগে থেকে বায়না দেওয়া ছিল। নৌকোয় ততক্ষণে চিঁড়েগুড়ের বস্তাগুলো উঠে গেছে। ওগুলো বান-ভাসি গাঁয়ের লোকদের জন্যে। তা ছাড়া আছে ডজন কয়েক পাঁউরুটি, কয়েক টিন মাখন আর দু-হাঁড়ি সন্দেশ। মিশনের কর্মীদের জন্যে।

বাবাজী এতক্ষণ মুখে আকাশ-ছোঁয়া বৈরাগ্যের একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। মালপত্তরের দিকে মাঝে মাঝে একটু আড়চোখে নজর রাখছিলেন। মালপত্তর সব উঠে গেলে পর তিনি শরদীশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে জানালেন তথাস্তু।

পাছে পায়ে কাদা লাগে সেইজন্যে বাবাজীকে পাঁজাকোলা করে তোলা হল নৌকোয়। খানিকটা যাওয়ার পর যখন চারদিকের ডাঙা একদম মুছে গেল, তখন নড়েচড়ে গান ধরলাম আমরা — স্বদেশী গান। বিরক্ত হয়ে বাবাজী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। নৌকোর নিচে জল ঘুলিয়ে উঠছে, ডুবন্ত তালগাছ-গুলোর দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় মিনিটে মিনিটে জল বাড়ছে। গতিক সুবিধের নয়। বাবাজী আমাদের ধমকে থামিয়ে দেবেন, সে-উপায়ও নেই। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরছে না। কমবয়সী চেলাদের সে-গান ভাল লাগবারই কথা।

অনেকখানি যাবার পরে দূরে গ্রাম দেখা গেল। নৌকো যাবে

না অত দূরে। জলে ডুবে থাকলেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চড়া। কাজেই হেঁটে যেতে হবে।

মিশনের ছেলেরা চিঁড়েগুড়ের বস্তা আর পাঁউরুটির ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে পা টিপে টিপে গাঁয়ের দিকে এগোতে লাগল। বাবাজীকে আমরা বললাম — আপনি থাকুন নৌকোয়। কেন আর কষ্ট করে যাবেন?

বাবাজী নাছোড়বান্দা। দূর থেকে বস্তা আর ঝুড়ির দিকে একবার করে আড়চোখে চান আর উদাস হয়ে বলেন — আহা হা, কেষ্টর জীবগুলোকে না দেখলে হয়? কী কষ্টেই না পড়েছে!

বাবাজীকে নিয়ে যেতে চেলাচামুণ্ডাদেরও ইচ্ছে ছিল না। ঐ লাশ তো তাদেরই কাঁধে ভর করবে। কিন্তু লাশ শেষ পর্যন্ত বইতেই হল।

সারাটা দিন চিঁড়েগুড় বিলি হল। ওদের সন্দেশ-পাঁউরুটিতে বেশ মোটা ভাগ বসিয়ে আমরা তিনজন সারা গাঁ ঘুরে দরকারী খবর আর ফটো যোগাড় করতে বেরোলাম। সন্ধ্যের ঠিক আগে নৌকো যখন ছেড়ে দিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমরা চলন্ত নৌকোয় উঠে বসলাম। আমাদের দেখে বাবাজী মুখটা কালো করলেন।

খানিকটা যাবার পর বালির চড়ায় নৌকো গেল আটকে। সবাইকে নামতে হল। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীরও এবার না নেমে উপায় নেই। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পেছনে একটা আর্তনাদ শোনা গেল — 'গেলাম, গেলাম'। তাকিয়ে দেখি বাবাজী প্রাণপণে হাত তুলে চেঁচাচ্ছেন। চোরাবালিতে তাঁর হাঁটু অবধি ডুবে গেছে। আর সুনীল জানা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে পড়ে যাওয়া তার ক্যামেরাটা তুলতে তুলতে বলছে — ভগবানের নাম করুন।

সবাই মিলে অনেক কষ্টে বাবাজীকে চোরাবালি থেকে টেনে তোলা হল।

কিন্তু নৌকোয় উঠে বাবাজীর দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বাবাজী একদম বদলে গেছেন। তাঁর চোখ আর ঢুলু ঢুলু নয়। রসকষও তাঁর বেশ আসে। আটপৌরে মানুষ যেমন হয় তেমনি।

এতক্ষণে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন — মহাশয়দের নিবাস? আমরা বললাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন — মহাশয়দের কী করা হয়? তাও বললাম। শুনে তিনি যা মন্তব্য করলেন তা থেকে বুঝলাম বাবাজী 'শনিবারের চিঠি'ও পড়েন।

পুরুচার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরোনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা — ঙো' গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।

'এই কী হচ্ছে? বর্ধমানে ও-গান বেআইনী জানো না?'

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! লোকে শুনলে তো বাঁধের নিচে আমাকে জ্যান্ত মাটিচাপা দিত।

সারাটা দিন চলে বাঁধ বাঁধার উৎসব। সবাই কোন না কোন কাজে হাত লাগিয়েছে। একটা জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। ব্যাপারটা কী?

গিয়ে দেখি কোদাল হাতে হায়াত সাহেব মাটি কাটছেন। আর সেই মাটি ঝুড়িতে করে মাথায় তুলে বাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে আসছেন সঈদুদ্দিন সাহেব। একজন যেমন মশার মত রোগা আর একজন তেমনি মোষের মত মোটা। ছোট ছোট ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করছে। দু-জনেই এ অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক।

অনেক দিনের জেল-খাটা স্বদেশী। কৃষক সমিতি এমন মানীগুণী লোকদেরও হাতে কোদাল আর মাথায় মাটির ঝুড়ি দিয়ে কাজে নামাতে পেরেছে দেখে গাঁয়ের চাষীদের ভারি ফুর্তি।

বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু তার জন্যে মিটিং কেন ঠেকে থাকবে? দূর দূর গ্রাম থেকে লাল নিশান উড়িয়ে এল একটার পর একটা মিছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুচকাওয়াজ করতে করতে আসছে একটার পর একটা সৈন্যবাহিনী। দেখতে দেখতে বাঁধের নিচে ছ-সাত হাজার লোকের ভিড় জমে উঠল। শহর থেকে ভাড়া-করা মাইক এসেছে। গোটা তল্লাট গম্ গম্ করছে তার আওয়াজে। নদীর ওপারের গ্রামগুলোতেও সভার ডাক পৌঁছুবে।

সন্ধ্যেবেলা গানের জলসা বসল সমিতির শিবিরে। গায়কেরা বসলেন উঁচু মাটির দাওয়ায়। সেটাই হল রঙ্গমঞ্চ। সামনের উঠোনে জলকাদার মধ্যে উবু হয়ে হয়ে বসল শ্রোতার দল। কয়েক হাজার হবে।

বাঁধ নিয়ে গান বেঁধেছে গাঁয়ের চাষীরা। তাদের এতদিনের দুঃখের পালা এবার তারা নিজের হাতে চুকিয়ে দেবে—এই একটি আবেগ তাদের সবাইকার গানে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের দু-জন সেরা শিল্পী—বিজন ভট্টাচার্য আর শম্ভু মিত্র। গাঁয়ের লোকে জমজমাট জলসা অনেকদিন শোনে নি।

জমিদারবাড়িতে পূজোপার্বণে কিংবা বিয়ে-সাদির সময় আগেকার আমলে শহর থেকে নাম-করা গাইয়ে-বাজিয়েদের বায়না দিয়ে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু তারা কখনও তাদের গানে চাষীদের কথা বলে নি; যতটুকু যা বলেছে, তাও হাসিমস্করা করার জন্যে। সে-সব গাইয়েদের ঢংঢাংও লোকের ভাল লাগে নি।

কিন্তু সমিতি যাদের এনেছে, তারা কিন্তু ভারি শাদাসিধে প্রথমটা তো তারা বুঝতেই পারেনি। ভেবেছিল হয়ত সমিতির লোক হবে। গান শুনে তবে বুঝল লোকগুলো যে-সে নয়, গানবাজনায় ওস্তাদ। আর কী গান! চাষীদের মনের কথা গাইয়ে বাবুরা জানল কেমন করে?

সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পরও বাঁধের মজুররা অনেক রাত্তির পর্যন্ত ঠায় উবু হয়ে বসে গান শোনে।

জীবনে তাদের এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম। লোকে হালগোরুর মত পয়সা দিয়ে খাটিয়ে নেয়, চোখ রাঙায়। তাই ফাঁকি দিতে পারলে তারা ছাড়ে না। আর এখানে এসে তারা শুনল — তাদের হাতে নাকি ন'টা ইউনিয়নের জীবনমরণ। তারাও তো এই বন্যার অভিশাপেই আজ নিঃস্ব। ভাঙা চাল ছাইবার জন্যে একমুঠো খড় পায় না। খড় পাবে কোথায়? ধানের জমিগুলো বন্যায় ভেসে যায়। ছেলেমেয়েরা সারাটা শীত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। তারপর ম্যালেরিয়ায় জীবনান্ত হয়। গাঁ ছেড়ে দলে দলে লোক তাই দেশান্তরী হচ্ছে। চাষ-আবাদ ছেড়ে লোকে শহরে গোলামি করতে ছুটছে।

বাঁধ বাঁধা হচ্ছে শুনে গাঁয়ের বড়লোকেরা তাই এবার পুকুর কাটবার জন্যে, বাগান করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা গাঁয়ের দিনমজুরদের বেশী মজুরির লোভ দেখিয়েছিল। তবু তারা গাঁ ছেড়ে বাঁধ বাঁধতে এসেছে। বাঁশের টোলে জল পড়ে, চিঁড়েমুড়ির ব্যবস্থা নেই, মুন্সিরা চুয়োর ঠিকমত মাপ নেয় না — ঠিকেদারদের শত দুর্ব্যবহার সহ্য করেও তারা আছে।

তারা চোখের ওপর দেখছে এই গাঁয়েরই গরীব চাষী ব্রজেশ্বর গড়াই মাটি কাটার জন্যে তার নিজের জমি, ভলান্টিয়ারদের জন্যে

তার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছে। বিনা মজুরিতে সে সকলকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে।

সাত্তার সাহেব নিজের খরচে ইউনিয়নের কর্মীদের জন্যে আলাদা তাঁবু ফেলেছেন।

মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে উদ্যত বর্ষা। ছোটনাগপুরে পাহাড়ের জটায় জটায় এখন বন্দী হয়ে আছে দু-চার দিনের বৃষ্টির জল। জটার বাঁধন খুলতেও বেশী দেরি নেই। জঙ্গল-পাহাড় ভেঙে কবে দুরন্ত ঢল নামবে কে জানে? ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে অজয়েব দুই তীরের মানুষ।

পুরুচার মানুষগুলো কিন্তু অজয়ের চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অদৃষ্টের লিখনকে তারা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য রচনা করার ভার নিয়েছে।

তারা হেঁকে বলছে, দেখ —

আকাশে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁধ উঠছে, দেখ — চার মানুষ সমান উঁচু বাঁধ।
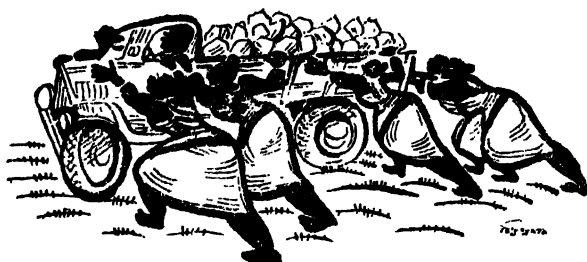
শাল-মহুয়ার ছায়ায়

মেদিনীপুর শহরের ওপর দিয়ে পাকা সড়ক গেছে পুব থেকে পশ্চিমে — বাঁকুড়া আর রানীগঞ্জ থেকে কটক আর বালাসোরের দিকে। এই রাস্তায় যদি কখনও এসে দাঁড়াও দেখবে এপারে ওপারে ছুখানা হয়ে আছে মেদিনীপুর জেলা।

ওপারে মাকড়া পাথরের ঢেউ-খেলানো মাঠজমি। ছুধারে অনুর্বর উঁচু জমির মাঝখানে ছোট ছোট খোয়াই -- সেখানে বোনা হয় ধান আর কলাই। মাঠজমি পেরিয়ে বড় বড় শালমহুয়ার গাছ, বিশাল অরণ্য। আর এপারে পলি-পড়া সমতল, নদীনালার কোলে দিগন্তছোঁয়া সবুজ ফসল আর মুখরিত গ্রাম। ওপারের বায়ুকোণে ছোটনাগপুরের পাহাড়তলী; এপারের অগ্নিকোণে বঙ্গোপসাগর। ওপারে সাঁওতালদের সন্তভুঁই; এপারে তাম্রলিপ্ত আর নগর চন্দ্রকোণা। ওপারে জঙ্গলমহাল, এপারে খেতখামার।

কেশপুর থেকে হাঁটা রাস্তায় চলেছি শালবনীর দিকে। যেতে যেতে মাটির রং বদলায়। পারুলিয়া, শীর্ষা, পারকোলে পার হয়ে

বনের ভেতর দিয়ে রাঙা মাটির রাস্তা। তেঁতুলমুড়ির বন পেরিয়ে মহিষডুবির বন। মাঝখানে ছোট ছোট জনবিরল গ্রাম — ওপর সাতশোল, মধ্য সাতশোল, নিচু সাতশোল। বনের মধ্যে সরু সরু ঝরনার নদী। কাঠের বেড়া-দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর। রাস্তায় দু-চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আর জনমনুষ্য নেই।

পায়ের নিচে উঁচু-নিচু শক্ত পাথুরে মাটি তেতে আগুন হয়ে আছে। বিশাল বন, কিন্তু কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। দুপাশে শুধু লতাপাতা। ক্লান্ত মানুষকে ছায়া দিতে পারে এমন গাছ নেই। যুদ্ধের ঠিকেদাররা যা পেয়েছে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে। যুদ্ধে কাঁচা শালকাঠ বেচে এরা লাল হয়ে গেছে। তবু এদের লালসা মেটেনি। চারাগাছগুলো পর্যন্ত এরা কেটে সাফ করেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে মেদিনীপুরে বনজঙ্গলের আর চিহ্ন থাকবে না। এভাবে জঙ্গলঝাড়াই আজ নতুন নয়; গত ষাট-সত্তর বছর ধরে ব্যবসাদাররা এখানকার বনজঙ্গল থেকে নির্বিচারে কাঠ কেটে কলকাতায় চালানী কারবার চালাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে সেটাই আরও তীব্র আকার নিয়েছে। স্টেশনে সাজানো কাঠের স্তূপগুলো দেখলে দূর থেকে ছোট ছোট টিলা বলে ভুল হয়।

এর সর্বনাশা ফল ফলতে শুরু করেছে। কেশপুর থেকে ঘাটাল পর্যন্ত মাইলের পর মাইল সেই দৃশ্যই দেখে এলাম।

চারিদিকে খরা-লাগা মাঠজমির ফুটিফাটার মত অবস্থা। একফোঁটা বৃষ্টি হবে কোথা থেকে? বৃষ্টির যারা উৎস, সেই বনজঙ্গলগুলোই যে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর থেকে কেশপুর বাসে আসতে একেবারেই ভিড় ছিল না। বাসের কণ্ডাক্টর দুঃখ করে বলল, বাজার বড্ড খারাপ পড়েছে, বাবু; বাসে আর প্যাসেঞ্জারই পাই না। অন্য অন্য বছর

এ-সময়টাতে লোকে ঝুলতে ঝুলতে যায়। রাস্তার মাঝখান থেকে লোক নেওয়ার আর জায়গা হয় না। অন্য অন্য বছর এতদিনে চাষবাস সব সারা। গাঁয়ের লোক জিনিসপত্তর কেনাকাটা করতে শহরে যায়। মামলা-মোকদ্দমারও ধুম পড়ে। তাই বছরের এই সময়টা বাসওয়ালাদের মরশুম।

কিন্তু এবার বৃষ্টির অভাবে কেউ চাষবাস করতে পারেনি।

রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। মাঠে মাঠে জ্বলে-যাওয়া হলুদবর্ণ ধান। পৃথিবীর সারা অঙ্গ যেন আগুনে ঝল্‌সানো।

শহরে গ্রামে সকলেরই মুখে আতঙ্কের ছাপ। পঞ্চাশ সালে তবু তো মাঠে ফসলের আশা নিয়ে চাষীরা দুর্ভিক্ষের দুটো মাস শাকপাতা খেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার একটা নয়, দুটো নয় — সামনের পনেরোটা মাস ফসল পাবার কোন লক্ষণই নেই। মানুষ কী করে বাঁচবে? শহরের চায়ের দোকানে, ডাক্তারখানায়, কোর্টকাছারির বটতলায় — সকলেরই মুখে এক কথা। মানুষ কী করে বাঁচবে? গাঁয়ের চাষী যদি মরে, শহরের উকিল, ডাক্তার, দোকানীর পেটেও যে টান পড়বে।

ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই করাল মূর্তি দেখেছিলাম তিন বছর আগে। তমলুক মহকুমায়।

মহিষাদলে যাবার রাস্তায় শ্মশানের পর শ্মশান। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ; মাঝখানে পড়ে আছে অসংখ্য নতুন মাটির কলসি। লোকে বলল, শ্মশানগুলো সবই নতুন হয়েছে। আগে ধান চাষ হত এইসব জমিতে। দুদিন আগে এলে দেখতেন না-খেয়ে-মরা মানুষগুলো বাড়ির উঠোনে উঠোনে পচে ভেপসে উঠেছে, তাদের লাশগুলো শেয়াল আর শকুনিতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঠে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়ানোরও কারো সামর্থ্য ছিল না।

খালের ধারে এসে হঠাৎ আঁতকে উঠেছিলাম। দুপাশে বাঁধের গায়ে সারবন্দীকঙ্কাল। মাথার খুলি আর পাঁজরের হাড়গুলো এমন ভাবে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে যে দেখে মনে হয় যেন তারা পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চাইছে।

রাস্তার দুপাশে গায়ে গা দিয়ে রয়েছে একটানা অনাবাদী জমি। রোদ্দুরে চোখ চাওয়া যায় না। মাঠে ক্বচিৎ কদাচিৎ গোরু চোখে পড়ে। আগে নাকি গোরুতে গোরুতে শাদা হয়ে থাকত সবুজ মাঠ।

সুতাহাটার রাস্তায়ও সেই একই দৃশ্য। রোদ্দুরে শাদা শাদা হাড়পাঁজর চিক্ চিক্ করছে খালের দুধারে। এক গ্লাস জল খাবার জন্যে হাতিবেড়া গ্রামে ঢুকে কোন বাড়িতেই ডেকে ডেকে কারো সাড়া পেলাম না। অনেক হাঁকডাকের পর এক বাড়ি থেকে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল এক বুড়ো। দেখলাম বুড়োর হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বুড়ো বলল, জল গড়িয়ে দেবারও লোক নেই কেউ। ভেতরে এসে নিজেই নিয়ে খান।

বুড়োর আপন বলতে কেউ নেই। এক ছেলে ছিল, সেও বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। গাঁয়েও আর কেউ নেই। সব উজাড় হয়ে গিয়েছে। যারা কোন রকমে বেঁচে বর্তে ছিল, চাটিবাটি উঠিয়ে তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। রানীচকেরও সেই একই কাহিনী।

চিরঞ্জীপুরে সনাতন মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। সনাতনের ঠিক পাশেই তিন মাথা এক করে বেঞ্চের ওপর বসে একজন। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দেখে মনে হল সনাতনের দাদা। জিজ্ঞেস করলাম – আপনার দাদার কি জ্বর হয়েছে? সনাতন প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরই বলল—দাদা নয় তো, ও আমার ছেলে। বছর কুড়ি বয়স হবে ওর। ভুগে ভুগে অমনি চেহারা।

গাঁ থেকে বেরিয়ে মনে হল পালাতে পারলে বাঁচি।

চক-তাড়নায় এসে দেখি খালের দুধারে আবার সেই নরকঙ্কালের মিছিল। রাস্তায় একজন লোক আমার মুখের চেহারা দেখে বলল, এ আর কী দেখছেন! আগে যান, পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবেন না।

একটু এগিয়ে দেখি সত্যিই তাই। দুদিকে গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। বিধবার রাজ্যে এসে পড়েছি যেন।

হলদি নদী পার হয়ে তেরোপাখিয়ার হাট। রাত্তিরটা কাটাতে হয়েছিল পান্থশালায়। সরু সরু ছোট্ট খাট জোড়া দিয়ে ফরাস পাতা ঢালাও তেল চিটে ময়লা বিছানা। খাটগুলো যেন ছারপোকার ডিপো। জঙ্গী বিমানের মত একরোখা মশাগুলো গোঁত্তা খেয়ে গায়ের ওপর হুল বসিয়ে দেয়।

পান্থশালায় ফড়ে আর ব্যাপারীর ভিড়। ছারপোকা আর মশার কামড়ে ঘুম হয় না বলে সারা রাত হুঁকো টানতে টানতে তারা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয়। শুয়ে শুয়েই ধানচালের দরদস্তুর করে, আর ফন্দি আঁটে কেমন করে বেশী দামে বাইরে চালান দেওয়া যায়।

গেঁওখালির হাটে যা দেখেছি, তার কাছে তেরোপাখিয়া তো কিছুই নয়। রূপনারায়ণ আর গঙ্গা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানটায় হাওড়া-চব্বিশ পরগণা-মেদিনীপুর তিন তিনটে জেলার সীমানা। নদীর পাড়ে অসংখ্য ছোট ছোট জেলেডিঙি। মাঝনদীতে বড় বড় নৌকো দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট ডিঙিতে বস্তা বস্তা চাল উঠছে। তারপর ডিঙিগুলো ভর্তি হলে সেই চাল গিয়ে জমা হবে বড় বড় নৌকোয়। জমাদার আছে, সেপাই আছে, ডজন খানেক হোমগার্ডও আছে। কিন্তু ছুঁচের ভেতর দিয়ে দিব্যি হাতি গলে যাচ্ছে! সরকারের আইন — একসঙ্গে বিশ মণের বেশী

ধানচাল জেলার বাইরে যেতে পারবে না। যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে—তারই জন্যে এই অভিনব চোরাই ব্যবস্থা। গোলাদার আর পাইকাররা ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে।

নন্দীগ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম আধমণ ধানের বদলে এক গরিব চাষী দিন কয়েক আগে এক বিঘা চাষের জমি বেচে দিয়েছে।

পুরুষোত্তমপুরের কৃষ্ণদাস অগস্তির কথা আজও মনে হলে চোখে জল আসে। কৃষ্ণদাস ছিল ও-অঞ্চলের কিশোর বাহিনীর সেরা নেতা। রোগা ছিপ্ ছিপে কালো চেহারা। চোখ দুটো টানা টানা। কোঁকড়া চুল। লাজুক লাজুক মুখের ভাব। ভারি মিষ্টি স্বভাব। তোতলামির জন্যে এমনিতেই কথা কম বলত। বাড়ির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

অভাবে অভাবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসের বাবার। একেই খাওয়া জোটে না, তার ওপর বাড়িতে অশান্তি। অভিমান করে চলে যাচ্ছিল কৃষ্ণদাস যেদিকে দুচোখ যায়। বেশীদূর যেতে পারেনি। পাশের গাঁয়ে এক জমিদারবাড়ির সামনে ঝোপের মধ্যে ভাঙা একটা পাল্কি পড়ে ছিল। না খাওয়ার দরুন শরীর টলছিল বলে সেই পাল্কির মধ্যে রাত্তিরে আশ্রয় নিয়েছিল কৃষ্ণদাস।

এদিকে সারা গাঁয়ে খোজ খোঁজ রব পড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণদাসকে সবাই ভালবাসে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পারঘাটার লোকগুলো বলল—কই, কৃষ্ণদাস তো এদিকে আসে নি।

খুঁজতে খুঁজতে তিন দিন পর ভাঙা পাল্কির ভেতর থেকে কৃষ্ণদাসের লাশ পাওয়া গেল। গোটা গাঁয়ের লোক সে-রাত্তিরে ঘুমোয় নি।

পাঁশকুড়া থেকে বাসে যেতে সতেরো নম্বর ইউনিয়ন। আকালের বছরে সেখানকার দশ জন পিছু একজনকে যমের মুখে তুলে দিতে হয়েছিল।

পূর্বচিস্কার রাস্তায় শকুন্তলার বাঁধের ওপর দেখেছিলাম কঙ্কালসার মানুষের মিছিল। ছেঁড়া মাদুর, মাটির হাঁড়ি আর পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় নিয়ে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ নাগপুরে, কেউ উড়িষ্যায়। গাঁয়ে ফসল উঠলে আবার তারা বাপদাদার ভিটেতে ফিরে আসবে। এখন তাদের একমাত্র চেষ্টা যাতে দিনকতক বেঁচে থাকতে পারে। যদি মরতেই হয়, ফিরে এসে ঘরের উঠোনে মরবে। পরে শুনেছি তাদের মধ্যে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল।

দু-বছর পরে মেদিনীপুরে ফিরে এসে জ্বলে-যাওয়া মাঠে মাঠে আবার সেই আকালের যেন আভাস পাচ্ছি। তমলুকের 'পুওর-হাউস'। সেবার সব থেকে শেষে এসেছিল পরমানন্দপুরের অমূল্য পাত্র। সোনা-রুপোর কাজ করত সে। শেষ সোনাদানা বেচে দিয়েও যখন বাঁচতে পারেনি, তখনই সে ছেলেবউয়ের হাত ধরে সরকারী 'পুওর-হাউসে' এসে উঠেছিল। এবার আকাল লাগলে দিনমজুর মাহিন্দারের সঙ্গে স্বর্ণকার অমূল্য পাত্রের কোন তফাত থাকবে না। সবাই একসঙ্গে রসাতলে যাবে।

রোড চন্দ্রকোণা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে রাস্তার দুপাশে ফসলের কোন চিহ্ন নেই। শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, আশ্বিনও যায় যায়। বৃষ্টির আর কোন আশা নেই দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে চাষীরা বওড়া আর মুগ বসান, শুকনাশ আর মানুষমারির মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়েছে। ধানের চারাগুলো একেবারে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং গোরুতেই খাক।

বরাবরকার বন্যা-অঞ্চল বাঁকা, জলসরা আর ক্ষীরপাই। সেখানকার নিচু মাঠঘাট শুক্নো ঠন্ ঠন্ করছে। বাঁকা নদীর ওপর দিয়ে লোক হেঁটেই পারাপার করছে। পুকুরগুলো এরই মধ্যে শুকিয়ে গেল। লোকে দুদিন পর তৃষ্ণার জলও পাবে না।

গাঁয়ে গাঁয়ে মজুরেরা বেকার। কারো জমিতে ফসল নেই, খাটাবে কে? তাই তারা গাঁ থেকে চাটি বাটি উঠিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেছে। একবার কপাল ঠুকে দেখবে যদি কাজ পাওয়া যায়।

এদিকে জমিদারদের কাছারিগুলো আবার সরগরম হয়ে উঠছে। ফসল হোক না হোক, আশ্বিন কিস্তির খাজনা তারা আদায় করে ছাড়বে। তারই জন্যে নায়েব-গোমস্তারা ছুরি শানাচ্ছে।

সাঁওতালরা পথে বেরিয়েছে। জঙ্গল গিয়ে তাদেরও ভেঙেছে শান্তির নীড়। বন নেই, শিকার নেই — কী নিয়ে আর থাকবে? দুচারজন আজও মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আজও বনের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। সন্ধ্যেবেলায় নির্জন বনে শুধু তাদেরই নিঃসঙ্গ মাদল বেজে ওঠে।

সাঁওতালরা কাজ নিয়েছে শালবনীর পাশেই ঝড়ভাঙা ডিগরির বিমানঘাঁটিতে। কেউ কেউ নামালের দিকে চলে গেছে পরের জমিতে খাটাখাটনি করতে। বন থেকে অনেক দূরে শহরের পাশে বসেছে সাঁওতালদের নতুন আস্তানা। সন্ধ্যে হলে তারা তেমনি মাদল বাজায়, কিন্তু ট্রেনের বাঁশীতে আর ট্রাকের শব্দে গানের সুর ডুবে যায়।

শহরের ধূলিধূসর শ্রমিকজীবনে তারা এক নতুন আস্বাদ পেয়েছে। যন্ত্র তাদের জাদু করেছে। বিরাট যন্ত্রদানব চোখের পলকে আকাশে উড়ে যায়; একটা বুল্‌ডোজার একা পাঁচশো মানুষের

সমান কাজ করে। পিচ-ঢালা রাস্তা দিয়ে সাঁওতাল মেয়েদের নিয়ে মিলিটারি ট্রাক হাওয়ার বেগে ছুটে যায়। ফুর্তিতে তারা গেয়ে ওঠে সাঁওতালী ঝুমুর। নতুন জীবন নিয়ে তারা গান বাঁধে—

ধানকলের বাঁশী বাজছে
যেতেও তো হবে অনেকখানি রাস্তা।
আর তো জঙ্গল নেই যে ফুল ফুটে থাকবে ;
আর তো ফুল নেই, তোর খোঁপায় বেঁধে দেবো।
আর তো শিকার নেই যে মাদল নিয়ে বনে বনে ঘুরবি।
আর আমরা পাবো ধানকলে যাবার ছুটি।
কদু ঘাসও তো শুকিয়ে গেছে,
কদুর মূলও তো ফুরিয়ে গেছে
ফিরে এসে কী খাবি ?
চল, ধানকলেতে চল।

মাদল বাজিয়ে তারা গায় :

মিলিটারি এল।
মিলিটারি আসার ফলে এক টাকার জিনিস হল তিন টাকার।
এখন আর কাজের ভাবনা নেই —
আর নামাল দিয়েও খাটতে যেতে হবে না।
পারকুলোর বদলে এখন ধান পাব -- ধান।
যাবার আসবার ভাবনা নেই
খাটবারও আর ভাবনা নেই
জঙ্গল হয়ে উঠেছে শহর।
হাওয়াই জাহাজের চিৎকারে আর গোলমালে
ঘুমোনোও হয়ে উঠেছে দায়।
আমাদের কল্‌মা সাঁওতালনী
তার মাথায় উঠেছে তেল।

খোঁপাতে আবার ফুল গুঁজেছে
কোত্থেকে পেল কে জানে ?
এখন গাঁয়ের মধ্যে চাল পাবি না
পাবি রোডে।
তাও চাল নয়,
পাবি ভাত — গরম ভাত।
কাজ খুব, কিন্তু তবু তো কাজ
হাতেও তো কিছু করলি।
তবে দেখিস ভাই, ট্রাকের নিচে পড়িস না।

শাল-মহুয়ার বন উজাড় করে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে মাইলের পর মাইল। ঝড়ভাঙায় তা দেখেছি, দেখলাম সরডিহায়। যে-অঞ্চলে মিলিটারি, সে-অঞ্চলে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। গাঁয়ের আকাশ ধুলোয় ধুলো হয়ে থাকে লরির চাকায়। যেখানে দোকান ছিল না, সেখানে দোকান ; যেখানে ঘর ছিল না, সেখানে পাকা দালান উঠেছে। গাঁয়ে এতদিন যারা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত তাদের মধ্যে একটু করিৎকর্মা লোক যারা -- তারা ঠিকেদারি করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। পাঁচ আঙুলের চার আঙুলে এখন তাদের হীরে-বসানো আংটি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে রংচঙে নাগ্‌রা। কেউ কেউ চোখে বিনা পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে চায়ের দোকানে উল্টো করে কাগজ ধরে দেখায় কত পড়ছে।

কাছেই খড়কডিহা গ্রাম। তেমাথায় একটা ফলারের দোকান। চা-ও পাওয়া যায় সেখানে। পাট-ভাঙা টকটকে লাল-পাড় শাড়িপরা একটি মেয়ে সেই দোকানের মালিক। দেখে মনে হয় এই গাঁয়েরই মেয়ে।

অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিলাম এ-অঞ্চলের একজন পুরনো

কংগ্রেস নেত্রীর কথা জিজ্ঞেস করব — তিরিশ সালে সারা বাংলাদেশ যাঁর নাম শুনেছিল। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম— 'আচ্ছা, বীরকন্যার কী খবর?' এদিককার লোকের দেওয়া নাম বীরকন্যা।

উত্তর যা পেলাম তাতে গরম চায়ে আমার মুখ পুড়ে যাবার যোগাড়। ফলারের দোকানের মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সে অনেক হিস্ট্রি, মশাই।' হিস্ট্রি কথার মানেটা জানা থাকলেও, কথাটা এমন একজনের মুখ থেকে শুনলাম যে, নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে যখন দেখেছিলাম গোরু চরাতে চরাতে রাখাল ছেলেরা একজন আর একজনকে 'হ্যালো জনি, হ্যালো জনি' বলে ডাকছে, তখন বুঝেছিলাম গোরা-পল্টনরা এসে গাঁয়ের লোকের মুখে দো-আঁশলা শব্দ যুগিয়েছে। কিন্তু বীরকন্যার খবর জিজ্ঞেস করেও আর কিছু পাওয়া গেল না।

মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম একজন নাপিত ধরতে হবে। নাপিতরা সব দেশেই লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। খুঁজতে খুঁজতে স্টেশনের কাছে একজনকে পাওয়া গেল। চুল ছাঁটাতে বসে গেলাম। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। গাঁয়ের সমস্ত খবর তার নখদর্পণে।

যা জানতে পারলাম তা এই—

বীরকন্যাকে আজ আর কেউ বীরকন্যা বলে না। আজ সে মিলিটারির ঠিকেদার। তিরিশ সালে জেল খেটে আসার পর জেলে সে আরও অনেকবার গেছে। কিন্তু স্বদেশী করে নয়, ফৌজদারী মামলায়। এ গাঁয়ে সে কবে কেমন করে এসেছে কেউ জানে না। শোনা যায়, সে নাকি ভিন্‌গাঁয়ের ধোপার মেয়ে। এ গাঁয়ে মাহাতোদের ঘরেই সে মানুষ। মাহাতোরা নাকি সাঁওতালদের

চেয়ে একটু উঁচু জাত। তিরিশ সালের ঢেউ এ-গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন সকলের আগে তিন-রঙা নিশান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের এই বাপমা-মরা মেয়েটা। চোখে তার আগুন জ্বলে উঠেছিল আর সেই আগুনে জাগিয়ে তুলেছিল সে ঘুমন্ত গোটা তল্লাটকে। হাজার মানুষের যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠেছিল, দুঃখে-পোড়া মেয়েটাই হল তার অধিনেত্রী। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল তার নতুন নাম — বীরকন্যা। সারা তল্লাটে সেদিন বন্দেমাতরম্ ছাড়া আওয়াজ নেই। মুক্তি-পাগল মানুষের সেই উদ্‌ভ্রান্ত মিছিল হারিয়ে গেল বন্দীশালায়। জেলের কষ্টকে কেউ কষ্ট বলে মনে করেনি। কষ্ট হয়েছিল স্বদেশী বাবুদের দেখে। তাঁরা চাষীদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তারা যেন মানুষই না। বাবুরা বলেছিলেন, জেলে গেলে দেশ স্বাধীন হবে। জেলে তো তারা হাজারে হাজারে গেল, দেশ তো কই স্বাধীন হল না! জেল থেকে ফিরে ক-বছর কী কষ্টেই না দিন গেছে। বাবুদের আর টিকি দেখা যায়নি। দেখা গেল ভোটের আগে। বাবুরা বললেন -- কংগ্রেসকে ভোট দিলেই এবার দেশ স্বাধীন। ভোট তারা দিয়েছে, তবু দেশ তো স্বাধীন হয়নি। বড়লোকেরা কেবল গরিবদের এমনি করে ঠকিয়ে এসেছে। অন্ধ রাগ আর তাদের দিশাহারা অভিমান আকাশ প্রমাণ হয়ে উঠল।

এই ক-বছরেই বীরকন্যা মরে গিয়ে হল বিষকন্যা।

ঠিক করলাম একবার নিজের চোখে দেখতে হবে মরে-যাওয়া বীরকন্যাকে।

ঘেরা উঠোনের মধ্যে টিনের আটচালা। সন্ধ্যা ঘনায়মান। দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছি। গল্প বলছে মরে যাওয়া বীরকন্যার পাতানো ছেলে। খড়গপুরের লাইনে রোজই লুটতরাজ আর

রাহাজানি হচ্ছে, টেলিগ্রাফের তার আর ওয়াগন-ওয়াগন মাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে — কেমন ক'রে, তার কাহিনী।

দুর্ভিক্ষের আগে এ-অঞ্চলে চোরডাকাতের বালাই ছিল না। পেটে যখন আগুন লাগল, দলে দলে গ্রামের লোক এসে তখন রেলের স্টেশনে ভেঙে পড়ল। মালগাড়ির তলার ফুটো দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত ধানচাল, রেললাইনের ওপর থেকে খুঁটে খুঁটে সেই চাল কুড়িয়ে নিত তারা। এত লোকের তো তাতে কুলোয় না। তাই ছড়ানো চালের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে মালগাড়ির ফাঁকের ভেতর লোহার ছুঁচলো শিক গলিয়ে দিয়ে বস্তা ফাঁসানোর ব্যবস্থা হল। তাতেও চাহিদা মেটে না। শিকের বদলে এবার যোগাড় হল বড় বড় লোহার শাবল। যাদের গায়ে কিছুটা জোর আছে, যারা একটু বেপরোয়া গোছের, তারা রাতের অন্ধকারে শাবল চালিয়ে মালগাড়ির দরোজা ফুটো করতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও ঝক্‌মারি অনেক। হল্লা হয়, পুলিশ আসে, হাতে হাতকড়া পড়ে! তাই ওদের মধ্যে যারা একটু হুঁশিয়ার গোছের লোক, তারা মাথা খাটিয়ে এমন সব সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি করতে লাগল যা দিয়ে নিঃশব্দে মালগাড়ির দরোজা একেবারে সটান খুলে ফেলা যায়। তারপর ভেতরে ঢুকে টেনে বার করো বস্তা বস্তা চাল। হলও তাই।

এদিকে মাঠে মাঠে সোনালি ধান উঠল। যে-সব চাষী না খেতে পেয়ে রেললাইনের ধারে এসে এতদিন দিন কাটাচ্ছিল, তারা ছেলে-বউয়ের হাত ধরে মহা আনন্দে ছুটে গেল গাঁয়ে। গেল না শুধু একদল লক্ষ্মীছাড়া হা-ঘরে মানুষ, গাঁয়ে যাদের নিজের বলতে কিচ্ছু নেই। ইস্টিশানের মাটি কামড়ে তারা পড়ে থাকল। এদের নিয়ে তৈরি হল দুঃসাহসী ডাকাতের দল। পেটের জ্বালায় মালগাড়ি লুট করতে গিয়ে লুটপাটই এদের জীবনের পেশা হয়ে দাঁড়াল।

আজ এখানকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এদের মাকড়সার জাল। শুধু মালগাড়ির ধানচাল নয়, পথচলা মানুষের জানপ্রাণ লুটতেও এরা পিছপাও নয়। এদের চোরাই মাল গোরুর গাড়িতে করে দোকানে দোকানে চালান যায় গ্রাম-গ্রামান্তরে। যাদের সঙ্গে একদিন পথের ধুলোয় পাশাপাশি শুয়ে এরা অনাহারে মৃত্যুর দিন গুনেছিল, তাদের কাছে এখন নির্লজ্জ দামে কাপড় বেচতেও এরা কসুর করে না।

কাছেই রেলের লাইন। একটা ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল। তারপর ট্রেনের ঝক্ ঝক্-ঝক্-ঝক্ ঝক্ ঝক্-ঝক্-ঝক্ শব্দের মধ্যে তাল কেটে গিয়ে কয়েকটা ধপ্-ধপাস্ ঝপ্ ধপাস্ শব্দ হল।

লোকটা গল্প থামিয়ে বলল, শুনলেন তো? চলন্ত গাড়ি থেকে চোরাই মালের বস্তা পড়ছে।

একটু পরে হঠাৎ দূরে গেটটার কাছে হারিকেনের আলো। আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু লালপাড় একটা শাদা শাড়ি দেখা গেল। পেছনে আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি। তাদের মাথায় ভারী ভারী মোট। গেটটা খুলে পাতানো ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে শাড়ি-পরা মূর্তি ফূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল -- 'ওরে শরৎ বসু খালাস পেয়েছে রে, থানার দারোগাবাবু বলল।' শুনে বুঝলাম এই নারীমূর্তিই মরে-যাওয়া বীরকন্যা।

যে এতক্ষণ গল্প বলছিল, সে হঠাৎ আওয়াজ শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেটের দিকে ছুটে গেল। গিয়ে কী যেন ফিস্ ফিস্ করে বলতেই পেছনের ছায়ামূর্তিগুলো তাড়াতাড়ি অন্ধকারের দিকে সরে গেল। একটু পরে মা আর ছেলে লণ্ঠন নিয়ে লম্বা উঠোনটা পেরিয়ে দাওয়ায় এসে উঠল।

দাওয়ায় উঠতেই পুরো মুখটা এবার আলোয় দেখতে পেলাম। এমন বীভৎস ক্রূর মুখ দেখব ভাবতেই পারিনি। এক

যুগ আগে এই মুখেই কি জ্বলে উঠেছিল স্বাধীনতার অগ্নিবর্ণ শপথ ?

বানিয়ে বললাম, হয়ত আমাকে মনে নেই। তিরিশ সালের আন্দোলনের কথা মনে আছে আপনার ?

মুহূর্তের জন্যে বীভৎস মুখের চেহারা বদলে গিয়ে খুব করুণ দেখাতে লাগল। দুটো ম্লান চোখ স্মৃতির মধ্যে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। তিনরঙা একটা নিশান আর তার নিচে হাজার হাজার মানুষের লম্বা একটা মিছিল বুঝি ঝিলিক দিয়ে গেল অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্যে বিষকন্যার মুখে দেখতে পেলাম শুধু একযুগ আগের বীরকন্যাকেই নয়, বিয়াল্লিশের বুলেট-বেঁধা মাতঙ্গিনী হাজরাকে।

কথা বেশি জমল না। অন্ধকারেই রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে। কাঠের গেটটা পেরিয়েই দেখলাম বেড়ার ধারে এক কোণে কতকগুলো বস্তার ওপর বসে অপেক্ষা করছে একদল ছায়ামূর্তি। একটু আগে শোনা দুঃসাহসী দল গড়ার কাহিনী, চলন্ত ট্রেন থেকে ধপাস্ ধপাস্ শব্দ, থানার দারোগার গল্প — মনে মনে সব কিছু মালার মত গেঁথে নিলাম। বুঝতে একটুও দেরি হল না — আমি ঢুকেছিলাম ডাকাতদলের খাস আস্তানায়। অন্ধকারে গায়ে কাঁটা দিয়ে মধ্যমণির মত জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল একটা বীভৎস মুখ।

—সে-মুখ মরে-যাওয়া বীরকন্যার।

মেদিনীপুর যে মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে শালমহুয়ার ছায়া। তাম্রলিপ্ত শ্মশান আজ, নগর চন্দ্রকোণা অরণ্য।

যারা ইংরেজের শিকল পরেছিল সকলের শেষে, সেই চুয়াড় বিদ্রোহীরা কোথায় আজ ? কোন্ শমীবৃক্ষে তোলা আছে তাদের অস্ত্র ?

খালের দু-ধারে নরকঙ্কালের মিছিলে কবে জীবন জেগে উঠবে ?

পাতালপুরীর রাজ্যে

আসানসোল থেকে বাসে বাংলার পশ্চিম দুয়ার বরাকরে চলেছি। বাইরে চোখ চাওয়া যায় না। আগুনের মত জ্বলছে রাঢ়দেশের রুক্ষ মাটি। যতদূর দৃষ্টি যায়, একটা গাছেরও ছায়া নজরে আসে না। পুব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বিশাল প্রান্তর জুড়ে সঙীনের মত উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি আর কয়লাখনির চাকাজড়ানো উদ্ধত হাঁ-মুখ। দূরে আকাশের কোল ঘেঁষে কল্যাণেশ্বরী পাহাড়। ঢেউখেলানো মাটি সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সামনে। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে রোদে-পোড়া মাঠের সবুজ। চড়াই উৎরাই রাস্তা। রাস্তার ওপর দিয়ে গেছে মালগাড়ির অসংখ্য লাইন। ফুরিয়ে-যাওয়া খনির বাইরের

খোলসটা জানিয়ে দেয় এককালে এখানেও খনি ছিল। মরচে-পড়া লোহার লম্বা লম্বা খুঁটি আর রং-চটা ইটের ভাঙা ভাঙা দেয়াল ফাঁকা মাঠে ধসে-পড়া মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বড় রাস্তার দু-পাশে সার-সার দোকান, কাত-হয়ে-পড়া মেটে ঘরের মজুর-বস্তি। লোক-গিজ্‌গিজ্‌ মাছি-ভন্‌ভন্‌ পচাইয়ের দোকানের সামনে ধুলোর মধ্যে বসে ডালমুট আর পাকৌড়ির ফেরিওয়ালা।

বরাকরে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়। রেললাইনের ওপারে মানবেড়িয়া গ্রামে আমাদের ইউনিয়ন অফিস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সুতোর মত বরাকর নদী। এপারে বর্ধমান, ওপারে মানভূম। বাংলার শেষ, বিহারের শুরু। ওপারে মাইকার পাহাড় রোদ্দুরে চিক্‌ চিক্‌ করে।

মানবেড়িয়া গ্রাম কে বলবে? পিচের রাস্তার ওপর ঝুলকালি-মাখা কোঠাবাড়ি। জলের কল। ইলেকট্রিক লাইট। রাস্তায় পা পাতা যায় না এত ভিড়। গাঁয়ের মধ্যে যেন শহর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

শুনলাম বরাকর বাজারে সেদিন যাত্রাগান হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম মাইলটাক্‌ পথ। ও হরি! গিয়ে দেখি যাত্রা নয়, রামলীলা। লেজওয়ালা হনুমান হাত-পা ছুঁড়ে হিন্দুস্থানীতে কী সব আওড়াচ্ছে। তাই দেখতে শহর ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে। অবাক লাগল — এ কেমন বাংলা দেশ! বরাকরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দেখলাম বাঙালীয়ানার চিহ্ন নেই। দোকানে দোকানে হিন্দী হরফের সাইনবোর্ড। শহরের সমস্ত লোকই প্রায় অবাঙালী।

কিন্তু বাংলার আর কোথাও এমন অপরূপ রাত্রি খুঁজে পাবে না। যেদিকে তাকাও মাঠের পর মাঠ জুড়ে আলোয় আলো রাত্রি। মনে হয়, আকাশের তারাগুলো উড়ে এসে বসেছে মাঠে মাঠে।

দূরে আসানসোল স্টেশনের সার্চ-লাইট দেখা যায় — বারবার আকাশ প্রদক্ষিণ করে কী যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

রাত্তিরে শুতে গিয়ে অবাক। ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং শব্দ কিসের? মেঝে থেকে মাথা তুলতেই আর শব্দ নেই। খিল খুলে বাইরে এলাম। রাস্তা নিশুতি। সামনের মাঠ পেরিয়ে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে বালতোড়িয়া কোলিয়ারি।

মাটির নিচে সুড়ঙ্গ গেছে। দিন নেই, রাত নেই — আলোবাতাসহীন সেই সুড়ঙ্গ থেকে কয়লা তোলে খনির মজুররা। ঠুং-ঠাং শব্দ কি সেই পাতালপুরীর?

পরদিন সকালে একেবারে অন্য রকম মনে হয় বরাকরকে।

মাঠটা বিষ্ঠায় ভরে আছে। দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না। কোলিয়ারির ঠিক পাশ দিয়ে গেছে মালগাড়ির লাইন। সামনেই কলের চালুনিতে কয়লা ঝাড়াই হচ্ছে। লোডিং কামিনরা সেই কয়লা ছোট ছোট টুকরিতে করে মালগাড়িতে বোঝাই করছে। মেয়ে মজুরদের বলে কামিন; কয়লা যারা বোঝাই করে তাদের বলে লোডিং কামিন। গা দিয়ে তাদের ঘাম গড়াচ্ছে; কয়লার গুঁড়ো লেগে চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে আছে। সারাদিন খেটেও এরা মাস গেলে পনেরো টাকাও মজুরি পায় না।

রেল লাইনের এপারে ওপারে দুটো কুলি বস্তি। উপর-ধাওড়া আর নিচু-ধাওড়া। বস্তিকে ওরা বলে ধাওড়া। এই ধাওড়াগুলো কী চিজ বাইরে থেকে একদম বোঝা যায় না।

উপর-ধাওড়ায় উঠতেই একটা জলের কল। কলের সামনে পর পর উপুড় করা প্রায় পাঁচশো কলসি। দোকানে কাপড় কিনতে লোকে যেমন কিউ করে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি মানুষের বদলে কলসিগুলো দাঁড়িয়ে আছে দু-ফোঁটা জলের জন্যে। উপর-ধাওড়ায় লোক থাকে হাজার খানেকের কিছু বেশি। তাদের জন্যে দুটো

মাত্র জলের কল। তাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলের জল থাকে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। একফোঁটা জলের জন্যে অনেক সময় রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়।

বাতিঘরের কাছে এসে দেখলাম রাতের পালি শেষ করে দলে দলে মজুর আর কামিনরা খাদ থেকে ওপরে উঠছে। সর্বাঙ্গে তাদের কয়লার গুঁড়ো যেন কেটে বসেছে। মাটির নিচের জলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে তারা উঠে আসছে। উঠেও শান্তি নেই। একফোঁটা জলের জন্যে ছট্‌ফট্ করতে হবে সারাটা দিন।

মুদিখানার রোয়াকে দেখলাম বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে মড়ার মত পড়ে আছে। মাটির নিচে আট ঘণ্টা এক নাগাড়ে খেটে কিছুক্ষণ হল সে ওপরে উঠেছে। ছোট ভাইটা জল ধরে রাখতে পারেনি; তাই ছায়ায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আজ আর তার স্নান হবে না। কয়লামাখা শরীর নিয়েই সন্ধ্যেবেলায় আবার খাদে নামতে হবে।

ধাওড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে গেছে ছোট অপ্রশস্ত গলি। দু-পাশে স্তূপাকার জঞ্জাল। নর্দমার বালাই নেই। গলির মধ্যে ঢুকলে পেচ্ছাপের তীব্র ঝাঁঝে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানে একদিন থাকলে নরকবাসের ভোগান্তি কী হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়।

ঘর তো নয়, অন্ধকূপের মত ছোট ছোট পায়রার খোপ। একটা মাত্র দরোজা। জানলার বদলে ছাদের ঠিক নিচে দুটো চারটে ঘুলঘুলি। ছোটবেলায় এক মফস্বল শহরে মেথরপাড়ায় এক শুয়োরের খোঁয়াড় দেখেছিলাম। চারদিক বন্ধ। তাতে শুধু একটা ছোট জানলা — সেই জানলা দিয়ে লোহার ফলা গলিয়ে শুয়োর মারা হত। আর অসহ্য যন্ত্রণায় শুয়োরগুলো ছট্‌ফট্ করত। ধাওড়াগুলো দেখে কেবলি আমার সেই শুয়োরের খোঁয়াড়গুলোর কথা মনে হচ্ছিল। একেকটা ঘরে শুধু একটা নয়, দুটো তিনটে

পরিবার তাদের পঙ্গপাল নিয়ে থাকে। আর তাদের পাশে শুয়ে থাকে ছাগল, শুয়োর, হাঁস, মুর্গী সব কিছু।

দরোজার বাইরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাঁচা কয়লার উনুন সর্বদা জ্বলছে। ঠিক পাশেই ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরা ধুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তাদের দেখবার কেউ নেই -- বাপ-মা দুজনেই গেছে কাজে। ঘরের মধ্যে তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু দুটো চারটে মাটির হাঁড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে একটু হলুদ-গোলা নিরামিষ ঝোল — এই হচ্ছে ওদের খাওয়া। আর এই খেয়ে ওরা দিন নেই রাত নেই ভূতের মত খাটে।

না খেটে যে উপায় নেই। দু-তিন পুরুষ আগে যজ্ঞেশ্বর তুরীদের এখানে ঘরবাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল। সব খুইয়ে এখন তারা বাপবেটায় এসে খনিতে কাজ নিয়েছে।

জামুরিয়া থানার পরিহারপুর গ্রাম কীভাবে উঠে যাচ্ছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। উঠে যাবার নোটিস এসেছে পরিহারপুরের বাসিন্দাদের ওপর। তারা উঠি-উঠি করেও উঠতে পারছে না। অনেকদিনের স্মৃতিজড়ানো গাছ, ডোবা, জায়গাজমির মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। দুদিন পরে যজ্ঞেশ্বর তুরীর মতনই তাদের অবস্থা হবে। খনির মালিকের কাছ থেকে তারা নামমাত্র ক্ষতি-পূরণের টাকা পাবে। তারপর পেটের জ্বালায় খনিতেই কাজ নিতে হবে।

খনির নিজস্ব হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতালকে মজুররা যমের মত ভয় করে। যার মৃত্যুভয় নেই, সেই শুধু এই হাসপাতালে আসে। আর কেউ হাসপাতালের ছায়া মাড়ায় না। হাত-পা কেটেকুটে গেলে মজুররা অনেক সময় হাসপাতালে আসে। দুর্ঘটনায় কারো অঙ্গহানি হলে মালিক তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে আইনত বাধ্য। কিন্তু সে আইন বড়লোকের জন্যে — গরিব লোকের জন্যে নয়।

ট্যাণ্ডেল কুলির কাজ করত কেষ্ট তেলি। বাতিঘরে লোহার ফটক পড়ে বছরখানেক আগে বেচারার ঘাড়টা চিরকালের মত বেঁকে গেল। একটা চোখও কানা হল। কিন্তু মামলা করেও আজ পর্যন্ত সে কোম্পানির কাছ থেকে তার পাওনা এক পয়সাও আদায় করতে পারেনি।

মাথার ওপর সময় সময় কয়লার চাপ ধসে, হঠাৎ-হঠাৎ গ্যাস হয়ে হামেশাই খাদের নিচে মানুষ মারা যায়। খাদের নিচে যারা কাজ করে, তাদের প্রাণ হাতে করে কাজ করতে হয়। এ ছাড়াও যা সব খুনজখম হয়, তা শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে। কয়লাখনির ঠিকেদার, ম্যানেজার সবাই প্রায় সাহেবসুবোরাই হয়ে থাকে। তাদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। জানোয়ারের চেয়েও বেশি হিংস্র এরা। এদের বদ্‌খেয়ালের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তার নিষ্কৃতি নেই। এদের হাতে একদল গুণ্ডার সর্দার থাকে। মনিবের একটু ইশারা পেলেই তারা যে-কোন কুলিকামিনকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। পাতালপুরীর রাজ্যে তাঁদের তাই অসীম দাপট। যারা খুন হয় তাদের লাশও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বছর ছুই আগে বালতোড়িয়া খাদে এমনি এক মুন্সীর লাথিতে মরেছিল হলেজ খালাসী ত্রিভঙ্গ রায়। ত্রিভঙ্গর লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারেনি। ত্রিভঙ্গই ছিল সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। কোম্পানির নামে ত্রিভঙ্গর বউ খেসারত চেয়ে নালিশ রুজু করেছিল। ত্রিভঙ্গর জীবনের দাম সাব্যস্ত হয়েছিল আট শো টাকা। কিন্তু এক বছরের ওপর মামলা চালাতেই নাকি আট শো টাকার ওপর খরচ পড়ে গিয়েছিল। ত্রিভঙ্গর বাড়ির কেউ বেঁচে থেকে সে-টাকা নিতে পেরেছিল কি না জানি না।

খনির ভেতরের খবর বাইরের বিশেষ কেউ জানে না। কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত ও চেনাশুনো লোক ছাড়া বাইরের কেউ খনির নিচে নামতেও পারে না। কাজেই লুকিয়ে খাদের নিচে নামার ব্যবস্থা করতে হল। একজন মুসলমান সর্দারের সঙ্গে কথা হল। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বলতে হবে "দেশকা আদমী।" চশমা খুলে রেখে যেতে হবে, শার্টের বদলে গেঞ্জি আর ধুতির বদলে লুঙ্গি পরতে হবে। রাত্তির তিনটের সময় দাঁড়াতে হবে বাতিঘরের সামনে। মালিকের লোক চিনে ফেললে বিপদ হতে পারে।

লিফ্‌টের মত বিরাট কপিকলটা বাইরের আলো ছেড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে যখন নিচে নামে, তখন হঠাৎ অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। নামতে নামতে মনে হয় যেন কোথায় কোন্ পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর জল-বায়ু-মাটির জন্যে মনপ্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ পায়ের নিচে কপিকলটা ঘটাং করে আটকায়। হাতে আপাদমস্তক ঢাকা সেফ্‌টি ল্যাম্প আর কাঁধে গাঁইতি নিয়ে সবাই নেমে দাঁড়ায়।

খাদের গা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। গোলকধাঁধার মত অসংখ্য সুড়ঙ্গ চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। মোড়ে মোড়ে হাওয়া চলাচলের খোলা দরোজা। একটু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো।

কয়লা কাটার নানা রকমের ব্যবস্থা। কেউ ড্রিল-মেশিনে কয়লা কাটছে, কেউ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিচ্ছে কয়লার বড় বড় চাংড়া, কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা চটাচ্ছে। যারা বারুদের আওয়াজ করে কয়লা 'গিরিয়ে' দেয়, তাদের বলে শর্ট-ফায়ারার। খাদমজুরদের বলে, মালকাটা। এখানে এক রকমের কিম্ভূত ভাষা গড়ে উঠেছে। না বাংলা, না হিন্দী — একরকমের

পাঁচমিশেলী ভাষা। এখানকার বাঙালী কুলিকামিনরাও সেই ভাষাতেই কথা বলে। খাদের নিচে টবে কয়লা ভর্তির পর সেই টব দড়ির কলে ওপরে তোলে হলেজ খালাসীরা। টব টেনে তোলার জন্যে আলাদা আলাদা লাইনপাতা সুড়ঙ্গ। সেই লাইন ঠিক রাখার জন্যে আছে সাফাই কুলি। ভর্তি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টব মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ টালোয়ানদের। ওপরের কয়লার চাপ ভেঙে পড়ার মত হলে কাঠের ঠেকো দেয় যারা, তাদের বলে কাঠমিস্ত্রি। এ ছাড়া রাজমিস্ত্রিও আছে ; তাদের কাজ ইটের গাঁথুনি দেওয়া। খাদের নিচে চোঁয়ানো জল মারার জন্যে আছে পাম্প খালাসী আর বেলিং খালাসী। বেলিং খালাসীরা হাতে করে ঝুড়ি আর বালতি দিয়ে জল মারে।

এদের সকলের ওপর খবরদারি করে পিট-সরকার, ইনচার্জ আর ওভারম্যান। এদের দস্তুরমত ঘুষ না দিলে কয়লাখাদে কারো বাঁচার ক্ষমতা নেই। পাতালপুরীর কোটাল এরা।

পদে পদে দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে খাদমজুরদের কাজ করতে হয়। এক মুহূর্ত অসতর্ক হলে বিপদ অনিবার্য। এক একজন মজুর এক পালিতে খেটে যা রোজকার করে তাতে পোষাতে পারে না। তাই দু-পালিতে একসঙ্গে আঠারো ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা খাটতে হয় অনেককে। খাদে যারা কাজ করে বেশিদিন তারা বাঁচে না। হুকওয়ার্ম, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ আর নিউমোনিয়া খনি অঞ্চলে সঙ্গের সাথী।

খাদের নিচে একটানা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সুড়ঙ্গকে বলে সুঁদ। সুঁদের মধ্যে মাথা নিচু করে হাঁটতে হয়। না হলে যে-কোন সময়ে শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে যাবার সম্ভাবনা।

অভ্যেস না থাকলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। কয়লার গুঁড়োয় দম আটকে আসে।

যখন ওপরে এলাম, সকাল হতে বেশি দেরি নেই। মনে হল দু-ঘণ্টার জন্যে যেন নরকবাস করে এলাম।

সামনে কয়লাখাদে কুলিদের ধাওড়াগুলো নজরে পড়ল। সকালের পালিতে যারা কাজে যাবে, তারা জেগে উঠেছে। পেটে খিদে নিয়ে এক নরককুণ্ড থেকে আর এক নরককুণ্ডে চলেছে তারা।

আর এক পাশে সাহেব ঠিকেদারের আর ম্যানেজারের বাংলো। সামনে লাল-লাল ফুলের বাগান। মনে হল হাজার হাজার মজুরের বুকের রক্ত ওদের বাগানে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

খনির মজুররা এতদিন মুখ বুঁজে সব সহ্য করে এসেছে। ওপরের দিকে অসহায়ভাবে হাত তুলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও আলোর খবর পৌঁচচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনি-মজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বীরশা মুণ্ডার বংশধরেরা ভগীরথের মত মাটির নিচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্তগঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা। তাদেরই দিকে তাকিয়ে খনিমালিক সাহেবদের বাগানের লাল ফুল লাল আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। দেরি নেই।

কলের কলকাতা

·····কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। হেই চলে হাওয়াগাড়ি হুস্ হুস্। ট্রাম চলে ঠন্ ঠন্। রাস্তায় এই লোক তো এই লোক। বাস্ রে, সে কী আজব শহর! কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে বাড়ি, কত যে গাড়ি, বাস্ রে! কোথাও মাটি নাই, কোথাও সাঁকো নাই — শুধু চুন-বালি-ইট আর শুধু পাথর। কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। কল খুললে জল, কল টিপলে আঁধারে ভাই জ্যোচ্ছনা ফিনিক দেয়। রাত রাত নয়, দিন দিন নয়। বাস্ রে, সে কী আজব শহর! কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে গলি, কত যে মোড় বাস

রে — যতই ঘুরি মাথা বন্ বন্, পা কন্ কন্ করে। হঠাৎ দেখি আমার ছায়া। তার পাশে ষণ্ডামার্কা লম্বাচওড়া আরও একটা ছায়া। পেছনে কে রে? দেখে তো আমি ভিরমি যাই। ইয়া ইয়া গোঁফ, ইয়া ইয়া দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। হাতে লম্বা লাঠি। বুকে ঝুলছে পাঞ্জাবির ওপর হাতকাটা রংচঙে একটা ফতুয়া। কাঁধে ঝোলানো একটা ঝুলি। ছোট ছেলে দেখেছে কি কপাৎ। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপি আর ইষ্টনাম জপি। হঠাৎ লোকটা এগিয়ে যায়। নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। নইলে এতক্ষণে কোন্ মুল্লুকে হাওয়া। বসে বসে হিং খাচ্ছি, হিং-টিং-ছট্ শুনছি। বাস্ রে, সে কী আজব শহর!, কী যে দেখলাম কওয়া যায় না। দু-পাশারি দোকান দু-পাশারি হাট — গাড়ি চাইলে গাড়ি, বাড়ি চাইলে বাড়ি। যা চাইবে তাই পাবে। বাস্ রে, কী আজব শহর! ·····

— পঁচিশ বছর আগে কালীঘাট থেকে পৈতে নিয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতার গল্প বলেছিল মোনা ঠাকুর। তাও কি বলতে চায়? যুদ্ধের সময় পুঁচকে আল্‌পিনেরও যেমন দাম বেড়ে যায়, কলকাতা থেকে ফিরে তেমনি দাম বেড়ে গেল মোনা ঠাকুরের। মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না! নইলে রোগাপট্‌কা ছেলেটাকে কে পুঁছত? টোকা মারলে যে চিৎপটাং হয়ে উল্টে পড়ে, পেয়ারা গাছে উঠতে হাঁটু কাঁপে — পৈতে নেবার পর তার কান-বেঁধানো ন্যাড়া মাথাটায় তেরে-কেটে-তাক বলে তবলা না বাজিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা মধুকুল্‌কুলির মগডাল থেকে চুরি করে পাড়া আস্ত দুটো আম ঘুষ দিয়ে তার কাছ থেকে গল্প শুনতে হল! তাও একদিনে নয়। টিপে টিপে সে তার পুঁজি ভাঙল। গরজ বড় বালাই; তাই রয়ে সয়েই শুনতে হল। কলকাতার গল্প না শুনে পেট আমাদের ফুলে উঠেছিল না!

কিন্তু এমন যে আজব শহর কলকাতা — যেখানে কল খুললে জল, কল টিপলে জ্যোচ্ছনা ফিনিক দেয় — তুদিন যেতে না যেতেই সে-শহর ছেড়ে এ-পোড়া দেশে ফিরে আসতে হল কেন ? সে-গল্পও বলেছিল মোনা ঠাকুর।

···কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খুন চাপে শহরটার মাথায়। মাথা খারাপ শহরটার। ফট্ ফট্ বন্ধ হয় দরজা আর জানলা। বড় বড় দালান যেন হানাবাড়ি। বুঝা যায় না মানুষজন আছে কি না আছে। রাস্তা ফাঁকা। রাত আঁধার। কানে তালা লাগে হল্লায় : হা রে রে রে রে রে ! মুসলমানগুলাকে কাটব। হা রে রে রে রে রে ! হিন্দুগুলাকে কাটব। ছুরি বার হয়, লাঠি বার হয়। লেগে যায় নারদ-নারদ। সে কী রক্ত, সে কী আগুন বাস্ রে। লাশ গড়ায় রাস্তায়। ভয়ডর নাই কিন্তু সাহেবদের। তারা মিটি মিটি চায় আর ফিক্ ফিক্ হাসে। হিন্দুও ছুঁবে না তাদের, মুসলমানও ছুঁবে না। রাজার জাত তো। গায়ে হাত দেয় সাহস কার ? এই না দেখে ধর্মশালার যাত্রী সব ভয়ে কাঠ। বলে প্রাণ নিয়ে পালাই। হাঁ-হাঁ করে আসে পাণ্ডারা। যাত্রীদের ট্যাঁকের দিকে তাকায় আর বলে : আহা-হা, ভয় কিসের ? আমরা আছি, ভয়, কিসের ? শোনে না কেউ। খ্যাপা শহর। কিচ্ছু মাথার যদি ঠিক থাকে। এই ঠাণ্ডা তো এই গরম। বাস্ রে! কখন কী হয় কী বলা যায় ? ছ্যাকরা গাড়িতে না উঠে, দরজা-জানলায় খড়খড়ি ফেলে সেই রাত্তিরে সব দে ছুট !······

বছর পাঁচেক পর নিজের চোখে দেখলাম সেই আজব শহরকে। মোনা ঠাকুরের সেই কালের কলকাতা।

ইস্টিশান থেকে কোথা দিয়ে কেমন করে এলাম কিছু মনে

নেই। যেন এক আলো-জ্বালা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলাম — এইটুকু মনে আছে। চারদিকে প্যাকিং বাক্সের মত গাদা-গাদা বাড়ি। একটার সঙ্গে একটা যেন আঠা দিয়ে সাঁটা।

পরদিন কলের জল আর বাসন মাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। পরিত্রাহি কাক ডাকছে কা-কা-কা। রোদ্দুর দেখা না গেলেও সকাল না হয়ে যায় না। দরজার খিল খুলে বাইরে দাঁড়াতেই অবাক। সামনে কানাগলির মোড়ে দোতলা-সমান উঁচু টেলিফোনের তার ঠিক যেন মুক্তোর মালার মত দেখাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের অগুনতি আয়নায় মুখ দেখছেন সাত রঙের সাত ঘোড়ায় চাপা সূর্যদেব।

কিন্তু যত যাই বলো সে খোলা মাঠ আর নীল চোখের মণির মত আকাশের কাছে প্যাকিং বাক্স-মার্কা এই শহর কিচ্ছু না। গলির মোড়ে ফুটো পয়সার মতো এই আকাশ। তাও দাঁড়িয়ে দেখার যো নেই। পেছন থেকে ভিড় এসে ঠেলে নিয়ে যাবে। কী বিচ্ছিরি শহর বাবা। এমন শহরে থাকতে আছে! গোমরামুখো লোকগুলো সব ঘাড় হেঁট করে ঘুরে বেড়ায়! একবার কেউ ডেকে জিজ্ঞেসও করে না — কেমন আছো হে! মনে মনে চটে যাই মোনা ঠাকুরের ওপর। একটা আস্ত দামড়া গাধা। এর চেয়ে ভাল ছিল আমার ডুগডুগির হাট, দুধপাতলার মাঠ। ঢের ভাল ছিল আমার ইচ্ছামতী নদী। উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বুক টান করে ঝাঁপ দাও, ডুব দিয়ে শামুক তোলো। চন্‌চনে খিদে। তার কাছে সরু সুতোর মত কলের জল — ছোঃ।

দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত যে-মানুষগুলো সকাল বেলায় রাস্তা দিয়ে হন্‌হনিয়ে হেঁটে গেল, বিকেলে দেখি তাদের দম গেছে ফুরিয়ে। কালিঝুলি মেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে টল্‌তে টল্‌তে ফেরে। গাঁয়ে এমন সময় নীলকুঠির মাঠ থেকে গোরুর পাল

পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে ফিরত। আর পশ্চিম দিকের আকাশটায় এই সময় কারা যেন সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিত।

আর ঠিক সেই সময় শানবাঁধানো রাস্তায় কলের কলকাতাকে বিষম ঠাট্টা করে পিচঢালা রাস্তায় মেয়েলি গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল — মাট্টি লেবে গো, মাটি।

মনে মনে আমি ভারি খুশি হই। কেমন জব্দ? কেমন?

আর আদিগন্ত মাঠ নয়, মাটির শুধু একটা ডেলার জন্যে আমার মনটা কেমন করে উঠল।

এমন যে নীরস শানবাঁধানো কলকাতা, তাকে কেমন করে একদিন ভালবেসে ফেললাম -- সে কথা আমার নিজেরই জানা নেই।

কানাগলির মোড়ে বাঁদিকের বাড়ির গায়ে ঝোলানো গ্যাসের টিমটিমে আলো। তার নিচে মিষ্টির দোকান। ডান হাতে কর্পোরেশনের ইস্কুল। তার সামনে বড় একটা রোয়াকে বুড়োদের আড্ডা। একটু এগিয়ে এক পা-কাটা দর্জির দোকান। ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা সেখানে। পাড়ায় নানা রকমের লোকের বাস। কেউ ডাক্তার, কেউ কবিরাজ; কারো লোহালক্কড়ের, কারো সোনারুপোর দোকান; কেউ সওদাগরী অফিসে চাকরি করে, কেউ বাড়িভাড়ার টাকায় বসে খায়। ডাক্তারবাবুর সেজো ভাই রেলের ক্যান্‌ভাসার, কবিরাজ মশাইয়ের ছোট ছেলে বিলেতফেরত। আড্ডিদের বাড়ির একছেলে টাকা জাল করে জেল খাটছে।

বিকেল হলে পাড়ার সব ছেলে ছাদে যায়। পাড়া কাঁপিয়ে শুধু একটা আওয়াজ ওঠে — ভোঁ-কাটা। একা আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।

বৌবাজারের মোড় থেকে এসপ্ল্যানেড অব্দি সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ের দু-পাশে ফাঁকা জমি। মলঙ্গা লেনের কাছটাতে

চীনেদের থিয়েটার। এদিক ওদিক দু-একটা পাঁউরুটি তৈরির কারখানা। এক জায়গায় রিক্সার ওপর ব'সে এক সন্ন্যাসিনী বুড়ী। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রুপোর গয়না দিয়ে মোড়া। ওড়িয়া ভাষায় বিড় বিড় করে কী সব বকে চলেছে। লোকে গদ্‌গদ হয়ে শুনছে আর পায়ের কাছে পয়সা ফেলছে।

খালি মাঠে সব সময় ভিড়। ডুগ-ডুগ-ডুগ ডুগ-ডুগ-ডুগ ঢোলক বাজছে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে কেউ। কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। কানে লোহার মাক্‌ড়ি। অনবরত মন্তর আওড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে চ্যাঁচাচ্ছে — লেড়কালোক একদফে হাততালি লাগাও। বকতে বকতে মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। শুকনো মুখ। দেখলেই মনে হয় সারা দিন কিছু খাওয়া হয়নি। বাজী দেখানো শেষ হতে না হতে ভিড় পাতলা হতে থাকে। পাছে পয়সা দিতে হয় তাই যে যার মত কেটে পড়ে। মাটিতে ছড়ানো দু-চার আনা পয়সা কুড়িয়ে নিতে নিতে শাপমুন্নি দিতে থাকে ভানুমতীর যাদুকর। ফুস্‌-মন্তরে পয়সাকে টাকা করতে পারে না তবে কিসের বাজীকর? পালাতে পালাতে মনে হয় শাপমুন্নিগুলো বুঝি আমার পেছনেই তাড়া করছে।

পাশে আর একটা ভিড়। দাড়িওয়ালা একজন হেকিম। পরনে তার লাল আলখাল্লা। গলায় হাড়ের মালা। চোখে নিকেলের ফ্রেমের মোটা চশমা। একটা দিক সুতো দিয়ে বাঁধা। সামনে তার একরাশ গাছ-গাছড়া, কাঁচা ছাল-চামড়া, হাড়, কাঁচের কৌটোয় জোঁক আর বিছে, নীল গাইয়ের চামর। বিচ্ছিরি নোংরা। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। কত সব ভারী ভারী রোগের নাম করছে। বাতলে দিচ্ছে কোন্ রোগের কোন্ দাওয়াই।

কানের খোল পরিষ্কার করতে বসেছে কেউ। কোথাও ভাঙা কাঁচ জোড়া লাগাবার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখতে ভেঙে পড়েছে

লোক। কোথাও চড়াই পাখি মানুষের ভাগ্য গণনা করছে। বিচিত্র ব্যাপার চলেছে লম্বা রাস্তাটা জুড়ে।

শীতকালে খালি মাঠগুলো জুড়ে তাঁবু পড়ে। সার্কাস আর কার্নিভালের। লাল-নীল আলোয় ঝলমল করে ওঠে গোটা তল্লাট। চাকা-লাগানো মোটা মোটা লোহার গরাদ-আঁটা খাঁচার মধ্যে ক্ষিধের সময় গজরাতে থাকে বাঘ আর সিংহ। মানুষের গন্ধে জিভ দিয়ে তাদের লালা গড়ায়। সার্কাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো থাকে জেলখানার কয়েদীর মত। রোজ সকালে উঠে কস্‌রতগুলো অভ্যেস করতে হয়। একটু ভুল হলে সপাং সপাং চাবুক। তাই মুখে সব সময় একটা মন-মরা ভাব। টিনের বেড়ার ফুটো দিয়ে তারা বাইরে তাকায় আর মার জন্যে ভাইবোনদের জন্যে মন কেমন করে।

হঠাৎ একটা ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন পকেটে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল — আমার মনিব্যাগ? যেই বলা অমনি 'ধর ধর' করে ছুটে গেল জনকয়েক লোক একজনের পেছনে। ছুটোছুটি হৈ-হল্লা। মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। ভদ্দরলোক যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। চোরকেও পাওয়া গেল না, চোর যারা ধরতে গেল তাদেরও আর টিকি দেখা গেল না।

তবু ভাল এই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তা। আকাশ এখানে অনেক দরাজ। এ-রাস্তার মানুষগুলোও যেন একটু আলাদা। ঢোলক বাজায়, হাততালি দেয়, হো-হো করে হাসে। উড়ে-মেড়ো-বাঙাল বলে কোন কথা এ-রাস্তার অভিধানে নেই।

সরু একটা গলির মধ্যে এঁদো ঘরে থাকে ফুচ্‌কা, পাকৌড়ি আর আলু-কাবলীওয়ালার দল। কাবলীওয়ালারা থাকে নেবুতলার মোড়ে। কাছ দিয়ে গেলে ভয়-ভয় করে। শুনি নাকি ছেলেধরাদের আস্তানা ওটা। ঝুলি দেখা যায় না, তবে থাকতেও তো পারে।

রাস্তার কলে ভিস্তিওয়ালার ভিড়। ড্রেনের জলে গা ধোয় একদল। হেঁইও হো, হেঁইও হো! সুর টেনে টেনে রাস্তার সুরকির ওপর দুরমুশ চালায় কর্পোরেশনের কুলি।

ঘামের গন্ধে, বন্‌বন্ শব্দে জমজমাট শহর কলকাতা। চুন-বালি-ইটেরও একটা সৌন্দর্য আছে। সন্ধ্যেবেলা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ট্রামের তারে চকমকির আগুন জ্বলে। পেতলের পিদিম জ্বালিয়ে ঘোরে মুশ্‌কিল-আশান।

হঠাৎ একদিন খেপে উঠল কলের কলকাতা। গলিগুলো সব এক টানে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। শহরময় চাঞ্চল্য। হৈ-হল্লা। গোলপুকুরে মিটিং। গোলদীঘিতে মিটিং। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিটিং। মিটিং ছাড়া মানুষ নেই। পাড়ার ছেলেরা বাঙাল বলে আর খেপায় না। কাঁধে হাত দিয়ে বলে, চল্ ভাই মিটিঙে।

পার্কে রোজ মিটিং আর ইস্কুলে পিকেটিং। এ এক নতুন মজা। কেন কেউ জানে না। কিন্তু মেতে উঠেছে সবাই। কেউ আর ছাদে নয়, সব রাস্তায়। জনসমুদ্রে জোয়ার লেগেছে।

একটু একটু করে বোঝা গেল। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? ইংরেজ চলে যাক, আমাদের দেশ আমাদের থাক। সত্যিই তো, কেন আমরা পরাধীন থাকব?

সারা শহরে আগুন। সে-আগুনে জ্বলছে বিলিতি কাপড়। পাড়ায় পাড়ায় দল বেরিয়েছে। গম্ গম্ করছে তাদের আওয়াজ—বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে ফেলো। দু-পাশের বাড়ি থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে রাশি রাশি বিলিতি কাপড়।

রোয়াকের ওপর বসে বুড়োর দল তকলি ঘোরাচ্ছে। সুতো কাটার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গল্পগুজব। সারাদিন কোথায় কী ঘটেছে

সন্ধ্যেবেলায় তার হিসেব-নিকেশ দেন ডাক্তারবাবুর ক্যানভাসার ভাই। আজ অমুক পার্কে লাঠি চালিয়েছে — উঃ কী রক্ত! কাল ময়দানে ঠিক গুলি চালাবে। ভয়ে আঁতকে উঠে যে যার ঘর আগলাবার জন্যে বুড়োর দল তক্‌লি হাতে করে বাড়িমুখো ছোটে।

সারাটা দিন নেশার মত লাগে। জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচানো চার আনা পয়সা দিয়ে শেয়ালদার মোড় থেকে কিনে আনি খদ্দরের টুপি। সেই টুপি মাথায় দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরি। দু-ধারের বাড়িগুলো থেকে লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ছোট্ট ছেলে কিন্তু বুকের পাটা দেখ! পুলিশকে মোটে কেয়ার করে না হে! — বুঝতে পেরে বুক যেন আরো দশ হাত হয়।

বিকেলে বৌবাজার স্ট্রীটে কংগ্রেস আপিসের সামনে এসে দাঁড়াই। বাড়িটাতে ঢোকবার মুখে রুটিবিস্কুটের দোকান। তার একপাশে তেলেভাজা ফুলুরি বিক্রি হয়। পাশ দিয়ে গেছে চোরা গলি। দুই ফুটপাথে দুরন্ত ভিড়।

পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। কংগ্রেস আপিসে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। দোতলায় রেলিঙের গায়ে উড়ল প্রকাণ্ড তিন-রঙা পতাকা। ততক্ষণে লাল পাগড়িতে ছেয়ে গেছে চোরাগলি। তেল-চক্‌চকে লাঠিগুলো উচিয়ে ধরে বীরদর্পে ঢুকে গেল তারা কংগ্রেস আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা তল্লাট। গেটের কাছে এসে দাঁড়াল কালো ঢাউস্ কয়েদী-গাড়ি। গোরা সার্জেন্টগুলো বেতের ছড়ি চালিয়ে ভিড় সরাতে লাগল। দোতলায় লাইন বেঁধে দাঁড়াল গান্ধীটুপি মাথায় দেওয়া ভলান্টিয়ারের দল। তাদের মাঝখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে 'ডিক্টেটর'।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ভর্তি ভ্যান্ চলল মুচিপাড়া থানায়। পেছনে পেছনে বিরাট জনতা। সেণ্ট-জেমস্ পার্কের ছোট ছোট ছেলেরা

খেলা ফেলে দিয়ে ছুটে আসে। থানার সামনে লোকে লোকারণ্য। রেলিঙের ওপর উঠে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা চ্যাঁচায় 'বন্দেমাতরম্ — লাল পাগড়ির মাথা গরম।' জোয়ারের জলের মত জনতা ফুলে ফুলে ওঠে।

তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পুলিশ ভয় পেয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ। যে যেদিকে পারে ছুট দেয়। এমনি করে রোজ ছুটতে ছুটতে রাস্তাঘাট চেনা হয়ে গেল।

একদিন কংগ্রেস আপিসের সামনে রোজকার মত দাঁড়িয়ে আছি। নিয়মিত পাশের বাড়িতে শাঁখ বেজেছে। পুলিশ ঢুকে গেছে কংগ্রেস আপিসে। হঠাৎ দেখি দোতলায় ভলান্টিয়ারদের মধ্যিখানে ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়ানো — আরে এ যে আমাদের রামদুলালবাবু, আমরা যাঁর বাড়িতে থাকি! কী আশ্চর্য, উনি আবার কবে ডিক্টেটর হলেন?

বুকটা দশ হাত ফুলে উঠল। সকলের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম — রামদুলালবাবু কী জয়! এমন ভাব নিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগলাম যেন ফুলের মালাটা আমার গলাতেই কেউ পরিয়ে দিয়েছে। না বলে পারলাম না — উনি হচ্ছেন আমাদের রামদুলালবাবু, চেনেন না? চারপাশে কেউ কথাটাকে তেমন আমল দিল না বলে একটু চুপ্‌সে গেলাম। আমার সঙ্গে চেনা আছে রামদুলালবাবুর, তাই লোকগুলোর অত হিংসে! আরেকজনের কাঁধে ভর দিয়ে মুখটা উঁচু করবার চেষ্টা করলাম, রামদুলালবাবু, যাতে আমাকে দেখতে পান। হাসুন না একটু রামদুলালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে। লোকগুলো একটু বুঝুক কী রকম সব লোকের সঙ্গে আমার আলাপ। যার কাঁধে ভর দিয়ে উঠেছিলাম, সে-লোকটা এক ঝট্‌কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল।

হাফ প্যাণ্টের ধুলো ঝেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন পুলিশের ভ্যান চলতে শুরু করেছে।

তেলেভাজার দোকানের পাশে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা বেআইনী বুলেটিন বিলি হচ্ছিল। এক কপি বুলেটিন কায়দা করে কোমরে গুঁজে বাড়ি ফিরে এলাম। পাড়ায় খবরটা দিতে হবে তো। খবর দিতে গিয়ে বেকুব বনে গেলাম। রামদুলালবাবু জেলে যাচ্ছেন, সে-খবর তো সকলেই জানে। কিন্তু আমাদের গলির এতবড় একটা গর্ব, পাড়ায় সেই উৎসাহ কই?

বাড়িতে যখন কেউ না থাকে, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উনুনের আঁচে বেআইনী বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়িওয়ালা জেলে গেছে আমাদেরই জন্যে, সারা দেশের ভালোর জন্যে। আর আমরা ঘরে বসে থাকব?

হঠাৎ একদিন কাকিমা বলে বসলেন, আমাকে নিয়ে চল্—আমি জেলে যাব।

সারা কলকাতা খেপে উঠেছে।

রাস্তা দিয়ে হরদম পুলিশের ভ্যান্ যাচ্ছে। সরু জালের ভেতর দিয়ে একগাদা কালো কালো মাথা দেখা যায়। আর মুহূর্মুহু আওয়াজ ওঠে 'বন্দেমাতরম্'। বড়বাজারের বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, মদের দোকানে পিকেটিং। লোকের মুখে স্বদেশী ছাড়া আর কথা নেই। যেদিন ইস্কুল হয়, সেদিন মাস্টার-ছাত্র একসঙ্গে বসে তক্‌লি কাটি।

খবরের কাগজ বন্ধ। কিন্তু তাতে খবর আটকে নেই। অলিগলির দেয়ালে লটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন ধরনের খবরের

কাগজ। কালো আর লাল কালিতে হাতে-লেখা সংবাদপত্র। কোন্ রাস্তায় কোন্ মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চলেছে, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে কোথায় কতদূর ছড়িয়ে পড়ল আগুন, জেলখানায় কী অমানুষিক অত্যাচার চলেছে — তার টুকরো টুকরো খবর। একদম নিচে লাল কালিতে লেখা — পড়ুন এবং নিজে কপি করে অন্যদের পড়ান। কাগজ-পেন্সিল হাতে নিয়ে এক দঙ্গল লোক সেই খবর টুকে নেয়। এমনি করে মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় খবর।

রামদুলালবাবুর দাদা একদিন বলেন, দেখা করতে যাবে জেলখানায়?

আনন্দে আটখানা হয়ে সঙ্গে গেলাম। কেমন করে ঘুরে ঘুরে গেলাম মনে নেই। ট্রাম থেকে নামতেই সামনে লোহার প্রকাণ্ড সিং-দরোজা। সেপাইয়ের হাতে চিঠি দেওয়া হল। হুকুম হল ভেতরে ঢোকার। ইংরেজের জেলখানায় হেঁট হয়ে ঢুকতে যা রাগ হচ্ছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে। আমরা একা নই, অনেকেই তো ঢুকছে।

আমরা ঢুকছি এমন সময় একটা কয়েদ-গাড়ি থেকে নতুন একদল বন্দী এসে হাজির। 'বন্দেমাতরম্' শব্দে জেলখানা কেঁপে উঠল। একটু এগিয়ে বাঁ হাতের শেষ ঘরটায় বন্দীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা। মেঝের ওপর সতরঞ্চি পাতা। ঘরভর্তি লোক। ঘরে একটি মাত্র টেবিল এবং চেয়ার। চেয়ারের ওপর যিনি বসে আছেন, তাঁকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাগজের ছবিতে হুবহু এই মুখ দেখেছি — সুভাষচন্দ্র বসু না? কয়েদ-গাড়ি থেকে একটা করে দল এসে নামছে আর তিনি ছুটে বাইরে যাচ্ছেন। তাদের জড়িয়ে ধরে বলছেন, তোমরা এসেছো?

জাল-দেওয়া জানলার কাছে ভেতরের বন্দীরা জেলওয়ার্ডারদের চোখ এড়িয়ে মাঝে মাঝে এসে ভিড় করছিল, কিন্তু সেপাইদের চোখ পড়তেই হুড়মুড় করে তারা সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল। একজন ডাক দিল — শোন খোকা! 'খোকা' বলাতে আত্মমর্যাদায় লাগলেও জানলার কাছে গেলাম। 'বাড়িতে আমার বুড়ী মা আছে, কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে — তুমি খবর দিও আমি ভাল আছি।' বাড়ির নম্বর নিয়েছিলাম কিন্তু কুঁড়েমি করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজও তা বিঁধে-থাকা কাঁটার মত মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করে ওঠে।

জেলের দরোজা পেরিয়ে যেন কেমন কেমন লাগল। রাস্তায় রাস্তায় ফুঁসে-ওঠা মানুষগুলো হাজির হচ্ছে এসে জেলখানার অন্ধকার গুহায়। কী পাবে তারা এখানে?

অমনি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল মার কাছে শেখা গান : ও তোর শিকল পরা ছল। শিকল পরে শিকলরে তুই করবি রে বিকল।

বুঝলাম না। তবু মনটা একটু তাজা হল।

তিন মাস অসুখে অচেতন ছিলাম। এর মধ্যে বাসা বদল হয়েছে। উঠে এসেছি ফিরিঙ্গি পাড়ায়! কানাগলি ছেড়ে বউবাজারের বড় রাস্তায়। যে-রাস্তায় থাকেন ডাকাতে কালী।

কাকিমা দেখলাম একদম বদলে গেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি ঘোরতর সংসারী। কাঁধ থেকে ভাবপ্রবণতার ভূত একেবারে নেমে গেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ কদাচিৎ জাল-দেওয়া কয়েদ-গাড়ি চোখে পড়ে।

ভাঁটার টানে জোয়ারের জল নেমে যায়। টল্‌তে টল্‌তে রাস্তায় বার হই। কই কোথায় সেই ফেনিয়ে-ওঠা জনসমুদ্র?

পার্কে মিটিং নেই, বড়বাজারে পিকেটিং নেই। একেবারে নতুন চেহারা শহরের। দেখলে কে বলবে এই শান্ত নিরীহ কলকাতা দু-দিন আগে রেগে খুন হয়ে উঠেছিল।

সব কিছুই বদ্‌লে গেছে। মনেই হয় না সামনের বড় রাস্তা কোন দিন বন্দেমাতরম শব্দে মুখর হয়েছিল। ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বাস। ভিড় আছে রাস্তায় — ম্লানমুখ অফিসযাত্রীর অফুরন্ত মিছিল।

চীনেপাড়া থেকে চোলাই-করা বড় বড় মদের জালা ধরে নিয়ে আসে আবগারী পুলিশ। দু-বগলের নিচে ক্রাচ্‌ দিয়ে ঘোরে খোঁড়া ইন্‌ফর্মার। গাঁজা-আফিঙের বেআইনী আড্ডাগুলো তার নখদর্পণে। ধরা-পড়া লোকগুলোর জামিন হয় জুতোর দোকানের মালিক চিং-থাই। সারাদিন এই সব দাঁড়িয়ে দেখি।

বিকেলে গিয়ে বসি পার্শী চোখের ডাক্তারের চশমার দোকানে। রাস্তায় মোটরের নম্বর গুনি। এত লোক তবু ফাঁকা ফাঁকা লাগে এই শহর।

পাশে দাঁতের হাসপাতালের নিচে ইহুদিদের যেন কী একটা পরব। জানলার ফাঁক দিয়ে গরম গরম হাতে-তৈরি রুটি বিলি হচ্ছে দুস্থ ইহুদিদের জন্যে। ঘুড়ির জন্যে মাঝে মাঝে লাগ হাতে রাস্তায় ছুটি। বাদাম-আখরোটের দোকানের সামনে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের চৌখুপি ঘর গুনি।

গীর্জায় রবিবারের ইস্কুল বসে। সকাল বেলায় মাঝে মাঝে গেটের সামনে পেরী সাহেব কেরোসিন কাঠের বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে ভাঙা বাংলায় অ্যার্কডিয়ন বাজিয়ে খ্রীষ্ট-সঙ্গীত করেন আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা বিলি করে লাল মলাটের চটি বই 'মথিলিখিত সুসমাচার'।

হঠাৎ একদিন বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেল জেলফেরত পুরনো বাড়িওয়ালা রামদুলালবাবুর সঙ্গে। গোম্‌রা মুখ দেখে মনে হয় না গলায় কোনদিন আবেগভরে মালা দেওয়া হয়েছিল। দুঃখ করে বললেন দাদুকে — আর বলেন কেন? মিছিমিছি জেলে যাওয়া হল। কর্পোরেশনে নতুন নিয়ম হয়েছে জেলে গেলে আর মাইনে বাড়বে না। কী মুশকিল বলুন তো? শুধু শুধু ক'টা মাস জেল ভোগ করতে হল।

ও! এই জন্যে জেলে গিয়েছিলেন? মাইনে বাড়াবার জন্যে?

নিজের ওপরই রাগ হল। কী বোকা আমি! এই লোকটার জন্যে এতদিন গর্ব করে বেড়িয়েছিলাম!

ফুটপাথে ছবি বিক্রি হয় — ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাসের ছবি।

নেভেনি আগুন। ছাই-চাপা হয়ে সে-আগুন জ্বলছে। উল্কার মত মাঝে মাঝে আকাশ থেকে খসে পড়ছে — মেছুয়াবাজার, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আগুনের হল্কার মত একেকটা খবর। বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে লালদীঘির দপ্তর। সারা বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে ফাঁসি যায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, আরও অসংখ্য শহীদ।

মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় কলকাতার গুমোট ভাঙে। তার পরই সব চুপচাপ। সন্ধ্যেবেলায় রাস্তায় হেঁকে যায় 'তপসে মাছ', 'বেল ফুলের মালা', 'কুল্‌পি বরফ'। জেল থেকে ফিরে এসে শশাঙ্কর খদ্দরধারী দাদা মিলের ধুতি পরে কলেজে যায়, ঘরের দরজা এঁটে পরীক্ষার জন্যে পড়ে।

বাইরের ঘরে বাবার কাছে আসেন এক সরকারী উকিল।

তিনি বলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার গল্প। ঘরে আর কারো থাকার হুকুম নেই। পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে আমি আর দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনি। ভদ্রলোক বলেন একেবারে মশ্‌গুল হয়ে। যেন তিনি সূর্য সেনেরই দলের লোক। গণেশ ঘোষের লেখা কবিতা সুর করে পড়েন। কল্পনা দত্তের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলে যান। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা বসে শুনি। অসাধারণ বলার ক্ষমতা ভদ্দরলোকের।

কাহিনী যে কখন শেষ হয়ে যায় খেয়ালই থাকে না। মাঝে মাঝে পর্দার পেছনে ধরা পড়ে গিয়ে বকুনিও খাই।

পাহাড়তলী, ধলঘাট, কালারপোল — যেন কুরুক্ষেত্রের এক একটা উপাখ্যান। সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত আর প্রীতি ওয়াদ্দেদার যেন কুরুক্ষেত্রের এক একজন মহারথী। নেই তাদের অক্ষৌহিণী সেনা। তারা বোঝাতে চেয়েছিল অসির বিরুদ্ধে চাই অসির ঝঞ্ঝনা।

সরকারী উকিল চলে যাবার পর রাগে হাত নিস্‌পিস করে। লোকটা একজন পয়লা নম্বরের ভণ্ড। মুখে এক, মনে এক। গল্প বলবার সময় দেশকে ভালবাসার কত কথাই না সে বলে। সূর্য সেনদের জন্যে দরদ যেন তার উথলে উঠছে। কিন্তু এর পরই বাড়ি ফিরে গিয়ে লোকটা বাংলার বীরদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে আইনের পাতা ঘাঁটতে বসবে। এরা মানুষ না আর কিছু?

আমি আর দাদা দেয়ালের ছবির কাছে প্রার্থনা জানাই — ঠাকুর, সূর্য সেনকে ওরা যেন খুঁজে না পায়।

রাস্তায় গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে বসি — দেশ স্বাধীন হবে কবে? গণৎকার গম্ভীর হয়ে আঁকজোক করে বলে — আড়াই বছর পরে।

তারপর কত আড়াই বছর কেটে গেল। গণৎকারদেরও কত

ভোল্‌ই না বদ্‌লাল। তারা কখনও বেকারদের হাত দেখে বলল চাকরি হবে কিনা, কখনও ভয়ে-পালানো লোকদের বলল জাপানী বোমায় প্রাণ যাবে কিনা। কলকাতার মরা গাঙে বার কয়েক ছোট বড় ঢেউ এসে লাগল বটে, কিন্তু বান ডাকল না আর।

কাকার জুট আপিসের চাকরি গেল। সরকারী আপিসে বাবার মাইনে কাটা গেল। ছা-পোষা সব সংসারেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অভাবের আগুন। শস্তা ভাড়ায় দেড়খানা ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে কোণ-ঠাসা হয়ে উঠে যেতে হল শহরতলীতে।

এই ক-বছরে আপন করে নিয়েছে এই শহর। আকাশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই অনেকদিন। বিকেল বেলায় ট্রাম-রাস্তায় এসে মাঝে মাঝে চকিতে দেখা হয়ে যায় — তাও পুরো আকাশ নয়, কুম্‌ড়োর ফালির মত এক একটা টুকরো। বিকেলবেলায় পথ-চল্‌তি লোকের ভিড়ে মিশে যাই। মজা লাগে লোকের মুখের দিকে তাকাতে। তাদের ভাবনা ফুটে ওঠে তাদের মুখের বিচিত্র রেখায়। কারো মুখে বিরক্তির ভাব। কারো মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কারো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। উল্টো করে জামা পরেছে কেউ। একা চলতে চলতে কারো হয়ত মনে পড়ে গেছে খুব হাসির একটা কথা। আপন মনে হেসে উঠে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে নেয় — কেউ দেখে ফেলেনি তো? একই রাস্তায় পাশাপাশি চলে এমনি নানা জাতের রকমারি মানুষ।

চেহারা বদ্‌লে যাচ্ছে শহরের। অজগরের পেটের মত ফুলে ফেঁপে ওঠে কলের কলকাতা। জমিজায়গা হারিয়ে শহরে আছড়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ — কাজের জন্যে, দু-মুঠো ভাতের জন্যে।

বেহুলার ভাসানে যে-ছেলেটা লখিন্দর সাজত, সে এখন চিনির কলে কাজ নিয়েছে।

কালাপানি পেরিয়ে হঠাৎ খবর এল আন্দামানের বন্দীরা অনশনে। চোখের আড়াল হবার পর যারা ভুলে গিয়েছিল এতদিন, তাদের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলেমেয়ের দল বার হয়ে এল রাস্তায়। তাজা রক্তে হাত রাঙাল লালমুখো সার্জেন্ট আর লাঠিয়াল পুলিশ। তবু ফুঁসে-ওঠা জনতার সেই ঢেউ বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে এল স্বদেশের মাটিতে।

ঢেউ আবার মিলিয়ে যায়। থম্ থম্ করে কলকাতার রাস্তা। মাঝে মাঝে মিটিং হয় পার্কে। চায়ের দোকানে তর্ক চলে। রাস্তায় ঝিলিক দিয়ে যায় একটা নতুন নিশান — লাল শালুর তৈরি। তার মাঝখানে কাস্তে আর হাতুড়ির হাতে-হাত-দেওয়া ছবি। যারা সেই নিশান বয়ে নিয়ে যায়, তারা কারখানার মজুর। হেঁকে বলে তারা — ইনকিলাব জিন্দাবাদ। হাত মুঠো-করা তাদের আওয়াজ যেন বজ্রের কানেও তালা ধরায়। মুখে মুখে রটে যায় একটা নাম — কমরেড লেনিন। একটা তারিখ — পয়লা মে।

যুদ্ধ বাধবে বাধবে করে একদিন বেধে যায়। ঘরের কাছে এগিয়ে আসে তার হুংকার। অন্ধকারে দেয়ালে দেয়ালে কারা এঁটে দেয় গোটা গোটা হরফের নিষিদ্ধ ইস্তাহার।

অন্ধ রাগে ফেটে পড়ে কলকাতার রাস্তা। বিয়াল্লিশ সালের আগস্টের কলকাতা। ট্রাম পুড়ছে। এবার লাঠি নয়, গুলি চলছে রাস্তায়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ভয়ডর নেই। ইট হাতে নিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াচ্ছে। বলছে: ইংরেজ, ভারত ছাড়ো।

দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য সেই আগুন জ্বলতে জ্বলতে একদিন ছাই হয়ে নিভে গেল।

কলকাতার ফুটপাথে সেদিন মরা মানুষের ভিড়ে পা পাতা যায় না। গ্রামগুলো সব পেটের জ্বালায় উঠে এসেছে শহরে। মড়া ডিঙিয়ে রাস্তা হাঁটতে হয়। বাতাসে দুর্গন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পচ্ ধরেছে কলকাতার শরীরে।

চাষীর গোলার ধান জমিদার-জোতদারদের মুঠোয়। জেলেদের নৌকো সরকারের হাতে আটক। গাঁয়ে চাল নেই। অভাবী মানুষগুলো তাই অন্নের সন্ধানে ছুটেছিল শহরের দিকে।

গাঁয়ের বীজ-বোনা মাঠে যখন ধানের শীষ আবার পেকে উঠল, তখন শোকে-তাপে-পোড়া মানুষগুলো আবার ফিরে গেল গাঁয়ে। মায়েরা গেল কোল খালি করে, মেয়েরা গেল হাতের লোহা ঘুচিয়ে!

যেমন ছিল তেমনি থাকল কলের কলকাতা। চালের দোকানে কিউ, কাপড়ের দোকানে কিউ। আলো-নেভানো রাত্তির। দিনের বেলায় জাপানীরা বোমা ফেলে গেল ড্যালহাউসী আর খিদিরপুরে। মাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে মরল ডকের মজুর।

তবুও কোন সাড়া নেই কলকাতার। মাঝে মাঝে দু-চার বার চোখ খুলে তাকালেও মুখ বুঁজে ঝিম্ মেরে পড়ে থাকল কলের কলকাতা।

রাস্তায় রাস্তায় আলোর চোখ থেকে খসে পড়ল ঠুলি। লড়াই শেষ। বুঁজিয়ে দেওয়া হল গড়খাই। মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল ব্যাফ্‌ল্‌ওয়াল। লালকেল্লায় বন্দী হল আজাদ হিন্দ।

হঠাৎ শহরের কী হল কে জানে?

ক্লাইভ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল।

সেই মিছিলে হাত ধরাধরি করে উড়ছে তিন-তিনটে নিশান — কংগ্রেস, লীগ আর ছাত্র-নওজোয়ানের। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় হেল্‌মেট লাগানো টমিগান আর রাইফেলধারী পুলিশ।

দু-পাশে বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া ইমারত। ডাকাত ক্লাইভের বংশধর শ্বেতাঙ্গ বোম্বেটেদের বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে বাড়িগুলোর গায়ে। চটকল আর ব্যাঙ্ক, খনি আর বাগান, জাহাজ আর রেলের সওদাগরী অফিস। ওপরতলার জানলা দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে কালা আদ্‌মীদের উদ্ধত মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে ধনকুবের বড় বড় সাহেব। তাদের আশেপাশে হাজির দু-চারটে কালো মুখ — কোটিপতি মাড়োয়ারী আর গুজরাটী বেনে।

হঠাৎ সামনের সশস্ত্র পুলিশ বেটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের ওপর। গর্জে উঠল কাঁদুনে বোমা। রাস্তার ওপর পুঁথিপত্রের ছেঁড়া পাতাগুলো ছড়িয়ে রক্তাক্ত দেহগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে গেল বাচ্চা ছেলেদের মিছিল। যাবার সময় শুধু চেঁচিয়ে জানান দিয়ে গেল — আবার ফিরে আসব।

সন্ধ্যার আগে সারা শহরে রটে গেল সেই খবর। রাগে রী রী করে উঠল তামাম শহর কলকাতা।

অলিগলি থেকে, বস্তি-মাঠকোঠা থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এল মানুষ। আগুনের ভাঁটার মত জ্বল্‌ছে চোখ। যে যা পেয়েছে, তাই নিয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। সে-রাত্তিরে গুলি চলল মেছোবাজারের মোড়ে।

তারপর বেপরোয়া কয়েকটা দিন, রাগে দিশেহারা কয়েকটা রাত্তির।

ডাস্টবিনগুলো এনে দাঁড় করানো হল রাস্তার মাঝখানে।

তৈরি হল নিরস্ত্র জন-সাধারণের ব্যারিকেড। সারা শহর ধোঁয়ায় ধোঁয়া। ইংরেজের যেখানে যা চিহ্ন, যেখানে যা প্রতীক — তা মুছে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল শিকল-পরা মানুষ।

ভয়ে গর্তে ঢুকে গেছে লালপাগড়ী পুলিশ। মিলিটারির হাতে দেওয়া হয়েছে কলকাতাকে সামাল দেবার ভার। লাঠিকে হটিয়ে দিয়ে বন্দুক হয়েছে রাজা।

ওয়েলিংটনের মোড়ে, হাজরার মোড়ে টমিগান, ব্রেনগান বাগিয়ে ওত পেতে বসে আছে গোরা পল্টন।

মিলিটারি লরির একা যাবার উপায় নেই। তাই রাইফেল উঁচিয়ে চলে দলবাঁধা কন্‌ভয়। তবু রেহাই নেই। পুঁচকে পুঁচকে ছেলেরা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে গিয়ে ঠিক আগুন লাগিয়ে দেয়। শিখে নিয়েছে তারা সমস্ত প্যাঁচ। গুলি ছুঁড়লে থামের পাশে আড়াল নেয়। গুলি লাগলে 'জয় হিন্দ' বলে উল্টে পড়ে মাটিতে।

সে এক দুরন্ত লড়াই। বন্দুকের মুখোমুখি হয় দুঃসাহসী ইট আর শুধু-হাত। লড়াই চলে পাঁচমাথা আর মানিকতলায়, লড়াই চলে পোড়াবাজার আর রসা-রাসবিহারীর মোড়ে।

সার-সার মিলিটারি লরি পুড়ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বিরাট চওড়া রাস্তায়; পুড়ছে সাহেবদের চা-কোম্পানির গাড়ি। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা তল্লাট। মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢেকে হুস্ হুস্ শব্দে ছুটে যাচ্ছে রাইফেলধারী গোরা পল্টন। গুলি চলছে বেপরোয়া। তবু রাস্তায় ভিড় কমে না। যেখান থেকে যে পেরেছে খসিয়ে নিয়েছে বড় বড় লোহার ডাণ্ডা। মাটিতে ঘেঁস্‌টানি লেগে তাতে হিস্ হিস্ শব্দ উঠছে।

ময়লা-কাপড়-পরা অগণিত মানুষ দাঁড়িয়ে। তারাই আজ রাস্তার রাজা। তাদের বিনা অনুমতিতে কোন গাড়ির যাবার

হুকুম নেই। যে-কোন গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে। জরুরী কাজ আছে বোঝাতে না পারলে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ছেলের হাত ধরে বাপ দাঁড়িয়ে আছে। গুলি চলুক পরোয়া নেই। ছেলের হাতের মোয়া নয় স্বাধীনতা। শয়তানের হাত মুচড়ে ছিনিয়ে নিতে হবে দেশের স্বাধীনতা, ফুটপাথে ভিড় জমিয়ে খেলা দেখাত যে-লোকটা, চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করত যে-ছেলেটা, শেয়ালদার বাজারে যে-লোকটা ঝাঁকামুটের কাজ করত, যে-ছেলেটা হোয়াইট্‌ওয়ের তলায় বসে জুতো বুরুশ করত আর বলত এমন পালিশ হবে বাবু জুতোয় মুখ দেখতে পাবেন — তারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে সেন্‌ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের রাস্তায়।

কার্জন পার্কে তিলধারণের জায়গা নেই। গুর্খা আর গোরা পল্টন যত পা পেছোয়, ক্ষুব্ধ জনসমুদ্র তত পা এগোয়। ট্রামের গুম্‌টির কাছাকাছি আসতে পারলেই বিলিতি হোটেল আর দোকানগুলোর মোটা কাঁচ ইট লেগে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ে।

ধর্মতলার চৌমাথা থেকে দূরে দেখা গেল একটা মিছিল। লাল, সবুজ আর তিন-রঙা নিশান গিঁঠ দিয়ে বাঁধা। এগিয়ে এল মিছিল। যাবে দক্ষিণে। হঠাৎ তিনটে ছুটন্ত মিলিটারি ট্রাক রাস্তার পাশে থেমে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল তিন গাড়ি পল্টন। রুখে দাঁড়িয়ে বুক টিপ করে তারা রাইফেল উঁচিয়ে ধরল। খবরদার! আর এক পা এগিয়েছো কি…

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছি। কী করবে মিছিলের আগের লোকগুলো? এগিয়ে যাবে? গুলির মুখে প্রাণ দেবে? 'জয়হিন্দ' আওয়াজ তুলে বুক টান করে লোকগুলো পা বাড়াল সামনের দিকে। কী হল? বীরপুঙ্গব পল্টনেরা যে সভয়ে সরে দাঁড়াল দু-পাশে! গুলি করার হুকুম ছিল, কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাহসে কুলোয়নি তাদের।

মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলছে কার্জন পার্কের দিকে।

তারই মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে দেখি একটা লাঠির আগায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল জ্বালিয়েছে। মশালটা নিয়ে আস্তে আস্তে সে রাস্তা পার হল। সামনে মিলিটারি ট্রাক দাঁড়ানো। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। কাছেই সাহেবদের একটা হোটেল। একতলার দরজা-জানলা আঁটা। ছেলেটা হাতে মশাল নিয়ে থাম বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সাহেবদের ভয়ার্ত চিৎকার। তারপর ছেলেটা থাম বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। মিলিটারি লরিটার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে যখন সে চৌমাথায় এসে পৌঁছল, তখন লুঙি-পরা এক ফলওয়ালা ঝুড়ি হাতে ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতে একটা কমলালেবু গুঁজে দিয়ে গেল। কমলালেবুটা ছাড়াচ্ছে এমন সময় পেছন দিক থেকে গুলির একটা শব্দ। ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিনিটে একজন করে বুলেট-বেঁধা লোক আসছে। কাউকে কাউকে হাসপাতালে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গে। যাদের আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের ঘিরে আকাশবাতাস জুড়ে বুকফাটা চিৎকার উঠছে।

একজন ধুতিপাঞ্জাবিপরা লোক ঢুকতে চাইছিল ইমার্জেন্সির ভেতর। ভলান্টিয়াররা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না।

— দেখুন মশাই, ভিড় বাড়াবেন না।

লোকটাও নাছোড়বান্দা। — আমার দরকার আছে।

ভলান্টিয়ার ছেলেটি এবার চটে গেল। কী দরকার শুনি?

লোকটা খুব শান্তভাবে বলল, গুলি লেগেছে আমার।

গুলি লেগেছে? দেখি?

লোকটা পেছন ফিরল। পিঠের দিকে জামা আর কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কড়ে আঙুল সমান ছ্যাঁদা হয়ে গেছে পিঠটা।

বলেননি কেন এতক্ষণ? হেঁটে এসেছেন কেন?

— বলে হন্তদন্ত হয়ে ভলান্টিয়ার ছেলেটি খাটের ওপর লোকটিকে শুইয়ে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

গুলি খেয়ে লোকটি ভয় পায়নি। তার লজ্জা গুলিটা বুকে না লেগে পিঠে এসে লেগেছে বলে। পিঠে গুলি দেখে লোকে না ভেবে বসে সে ভয়ে পালাচ্ছিল।

রাজাবাজার বস্তিতে শহীদ হল কদম রসুল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা বস্তির সবাই দড়ির ভাঙা খাটিয়াগুলো রাস্তায় টেনে মিটিং করল। সবাই দু-চার পয়সা করে চাঁদা দেবে। বাঁচিয়ে রাখবে তারা কদম রসুলের অসহায় কাচ্চাবাচ্চাদের। পয়সা দেবে যারা সারাদিন রিক্সা টানে, বিড়ি বাঁধে, ফেরি করে জিনিষ বেচে, কলকারখানায় কাজ করে। মরদ ছিল কদম রসুল। গ্যাস কোম্পানির ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা ছিল সে। মালিকের চোখ-রাঙানিকে কখনও ভয় করেনি। দিল্ ছিল তার। বস্তির সবাই তাকে ভালবাসে।

কদম রসুলের বাচ্চা ফুট্‌ফুটে মেয়েটা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে সকলের মুখের দিকে। কোথায় গেছে তার আব্বাজান?

শুধু মানুষ খুন নয়, জানোয়ারগুলো লুটের রাজত্ব চালায়। পানের দোকান থেকে ছিনিয়ে নেয় টাকাপয়সা, মনিহারি দোকান থেকে দামী জিনিষ, বস্তি থেকে হাঁস-মুরগি।

রাত্তিরে জ্বলন্ত আগুনের আলোয় তারা রাইফেল আর টমিগানের মুখে শিকার করে বেড়ায় নিরস্ত্র মানুষ — গুলি লেগে দোতলার বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে ছ-বছরের কচি মেয়ে।

যখন উঠে দাঁড়াল সারা শহর, বসে থাকলেন পাকা-চুল নেতারা।

শুধু বসে থাকলেন না, গুণ্ডা দুর্নাম দিয়ে বসিয়ে দিলেন তাঁরা গোটা শহরের মানুষকে।

আস্তে আস্তে আল্গা হয়ে গেল মুঠো। ট্রামগাড়ি আবার চলতে লাগল। যেখানকার সেখানে ফিরে গেল ডাস্টবিন। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে লালদীঘির দিকে অফিসযাত্রীর দল আবার পা বাড়াল।

কিন্তু ইংরেজের টনক নড়ে গিয়েছিল। সেপাই সান্ত্রীও আর তার বাধ্য নয়। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভাল। নইলে কপালে অনেক দুঃখ।

ইংরেজ গেল। কিন্তু যেতে যেতে রাস্তায় বেশ কিছু কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

তারপর বছর না যেতে দেশ ভাগ। ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলল কলকাতার রাস্তা জুড়ে। মৃত্যুকে এত বীভৎস হতে কেউ কখনও দেখেনি। ভরে গেল রাস্তা চালচুলোহীন উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে।

ইতিহাস নয়। এইখানে শেষ হল কলকাতার গল্প।

দিন যায়, বছর যায়। কেউ ব'লে শেষ করতে পারে না কলকাতার গল্প। ট্রামের তারে, বাসের চাকায় নিজের গল্প নিজেই বলে যায় কলের কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় আগুনের অক্ষরে ইতিহাস লেখে, আবার নিজেই মুছে দেয়।

কলকাতার ইটের পাঁজরে লুকিয়ে আছে ভালবাসার ঝরনা। সে ঝরনা কখনও শুকোয় না। যতদিন মানুষ আছে এই শহরে, ততদিন অফুরন্ত এই ভালবাসার ঝরনা।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে সেই ভালবাসা। জীর্ণ দালানগুলোর ভিত নড়ে ওঠে; আকাশে বাতাসে ওঠে বজ্রের নিনাদ। যতদিন হাতের সব শিকল ভেঙে না পড়ছে, রাগ শান্ত হবে না কলকাতার।

শিয়ালদহ আর বৌবাজারের মোড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাক-বরাবর পশ্চিমে তাকিয়ে কী দেখতে পাও? ধোঁয়াটে দালান ছাড়া আর কিচ্ছু না। কিন্তু ক-বছর আগেও ঠিক ঐখানে দাঁড়ালে সোজা দেখতে পেতে হল্‌ওয়েল মনুমেণ্ট। পাথরের খোদাই করা ইংরেজদের মিথ্যে ইতিহাস। কলকাতার মানুষ সেই জাল ইতিহাসকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আন্দোলনের জোয়ারে।

কিন্তু আজও ময়দানের পাথরের বহু স্তম্ভে, মনুমেণ্টের গায়ে ভারতবাসীর মুখে-চুনকালি-দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ বজায় আছে। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম বদ্‌লালেও ক্লাইভের বংশধরেরা আজও চক্‌মিলানো বড় বড় দালানে বহালতবিয়তে বেঁচে আছে। চা-বাগান, চটকল, কয়লার খনি থেকে শুষে খাচ্ছে তারা কালা আদমির রক্ত। আর দেশী দালালরা তাদের এঁটো পাতা চাট্‌ছে।

কাগজ পড়ি আর রাত্তিরে মাঝে মাঝে উড়োজাহাজের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। যদি যুদ্ধ হয়? বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে যাবে পড়ো পড়ো দেয়ালের শহর কলকাতা। ধুলোর মধ্যে ধুলো হয়ে যাবে এ শহরের তামাম মানুষ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখি: আলোয় আলো হয়ে আছে সারা কলকাতা। শান্তির পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় চলেছে মানুষের বিচিত্র মিছিল। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে শাদা পায়রা। যত তারা এগোচ্ছে দুপাশে মাথা তুলছে নতুন নতুন দালান। চেহারা বদ্‌লে গেছে শহরের। চেহারা বদ্‌লে গেছে মানুষের। চোখে মুখে উপছে পড়ছে তাদের স্বাস্থ্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল নিয়ে হাসছে।

ঘুম ভেঙে কলকাতাকে বলি: স্বপ্নের সেই সুন্দর দিন চলো এগিয়ে আনি।

জগদ্দল পাথর

কলকাতা থেকে নাক-বরাবর রাস্তা গেছে সোজা উত্তরে। ব্যারাকপুর রোডের দু-পাশে যদি তাকাও দেখবে লম্বা পাঁচিলে গণ্ডী দেওয়া উঠোনের মধ্যে দৈত্যের মত ইমারত। কালিঝুলি-মাখা কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা। করোগেট টিনের ছাপ্পর ফুটো করে আকাশের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে অসংখ্য সরু সরু চিম্‌নি।

সামনে লোহার প্রকাণ্ড ফটক। তাতে একটা মাত্র মানুষ গলে

যাবার মত ছোট্ট এতটুকু ফুটো। বাইরে তাজা কার্তুজের বেল্ট পৈতের মত গলায় ঝুলিয়ে টুলের ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছে বন্দুকধারী পাহারা। ফটকের সামনে ধুলোর মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে আছে তেলেভাজা-মিঠাই আর চানাচুর-গরম। চারপাশে এঁটো শালপাতার জঙ্গল।

কারখানার গা ঘেঁষে এব্ড়ো খেব্ড়ো হাড়-বার-করা গলি। দু-পাশে তার কুলিলাইন। মোড়ের ওপর ছাইপাঁশের উঁচু ঢিবি।

ব্যারাকপুর রোড কোথাও কোথাও কাটা পড়েছে রেলের লাইনে। মালগাড়ি যাবার রেলপাতা রাস্তায়। চটের বস্তা পাড়ি দেবে সাত সমুদ্র তেরো নদী। সাত রাজার ধন মানিক আসবে দেশে — ক্লাইভ স্ট্রীটের বিদেশী সওদাগর আর তাদের দেশী মুৎসুদ্দিদের পকেটে। একগলা জলে দাঁড়িয়ে যারা বুনেছে পাট আর সেই পাটের আঁশ দিয়ে বুনেছে যারা চট, তারা সবাই থাকবে না খেয়ে।

জগদ্দলে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। রাস্তায় জ্বলে উঠল আলো। কানে তালা ধরিয়ে কারখানায় কারখানার বেজে উঠল ভোঁ। হঠাৎ রাস্তা লোকে লোকারণ্য। হাঁ হয়ে খুলে গেল কারখানার প্রকাণ্ড গেট। গল্গলিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত-নিঙড়ানো অসংখ্য মানুষ। পায়ে পায়ে উড়ছে কুয়াশার মত দম-আট্কানো ধুলো। কাঁধে কাঁধ দিয়ে চলেছে বাঙালী-বিহারী-মাদ্রাজী-ওড়িয়া নানা জাতের মানুষ। চুলের সঙ্গে আট্কে আছে চটের ফেঁসো। দূর থেকে ঠিক পাকা চুলের মত দেখায়।

ইউনিয়ন অফিসে সত্য দাশের সঙ্গে দেখা। জগদ্দলের ছেলেবুড়ো সকলেরই 'মাস্টার মশাই'। এ-অঞ্চলে মাস্টার মশাইকে

চেনে না এমন লোক নেই। পরনে ময়লা একটা পা-জামা। পায়ে গোড়ালি-বিহীন ছেঁড়া কাব্‌লী জুতো। গোঁফ-দাড়ির অভাবে খুবই ছেলেমানুষ দেখায়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে হয়েও মাস্টার মশাই চটকলের মজুরদের মধ্যে বেমালুম মিশে গেছেন।

মাস্টার মশাইকে নিয়ে জগদ্দলের রাস্তায় বার হওয়াই মুশকিল। দু-পাশ থেকে টানাটানি করে অসংখ্য লোক। সকলেরই দরকার মাস্টার মশাইকে। কারখানার সাহেব বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, একটা কিছু না করলেই নয়। ছাঁটাই চলছে অমুক কলে। ধর্মঘট না করলে চলছে না আর। ছুটির দরখাস্ত লিখে দিতে হবে একটা। এমনি হাজার দরকারে মাস্টার মশাইকে চাই। চা তাঁকে খেতেই হবে। নইলে রাগ করবে ঢেন্‌কানলের রঘুয়া।

সরু একটা গলির মধ্যে দোকান। টিন দিয়ে ছাওয়া বাঁশের চাঁচের ঘর। বাইরের বারান্দা থেকে ঘরের মেঝে বেশ একটু নিচু। সারি সারি বেঞ্চি পাতা। ঘরে একটামাত্র দরজা। জানলার বালাই নেই। ঘরটা বেজায় স্যাঁৎসেঁতে। মিল-ফেরত কুলির দল বেঞ্চিতে সজোরে ঠ্যাং তুলে সর্দার আর বাবুদের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে।

অ্যালায়েন্স মিলের বিমার সুখদেওয়ের সঙ্গে আলাপ হল চায়ের দোকানে। রোগা কালো হাড় বার-করা চেহারা। চোখ দুটো অসম্ভব চক্‌চকে। সপ্তাহে সপ্তাহে যে মজুরি পাওয়া যায়, তাকে বলে হপ্তা। সুখদেও হপ্তা পায় আট-ন' টাকা। মা-বাপ ছেলেবউ নিয়ে আট জনের সংসার তাতে কিছুতেই চলতে চায় না। আধপেটা খেয়ে পাঁচদিনের চালে সাতদিন চালাতে হয়। তাও প্রতি চার সেরে আধ সের করে ইটের কুচো। খেয়ে খেয়ে পেটের ভেতরটা কংক্রিটে ঠাসা হয়ে গেছে।

ফতুয়ার পকেট থেকে পোস্টকার্ডে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা একটা ভাঁজ-করা চিঠি বার করে সুখদেও। দেশ তার উড়িষ্যায়। শ্রাবণ-আশ্বিনে ব্রাহ্মণী নদীর উপরো-উপরি দু-দুবার বানে ডুবে গেছে ধান আর রবিখন্দ। তাই বারবার করে যেতে লিখেছে। কিন্তু যাবে কেমন করে? দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকোনো। ঘরে যেতে গিয়ে ভিটেটাও শেষে লাটে ওঠাবে?

ভোর হতেই লাইনে লাইনে কাবলীওলারা ঘোরে। কাবলী জুতোর মশ্‌মশ্‌ আর লাঠির ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দে সবাই চমকে চমকে ওঠে। শুক্র, শনি, রবি — আঁতপুরের নিমতলায় কিংবা কারখানার গেটে কুলিদের তারা পাকড়াও করে। বেশি কথার লোক নয় তারা। বুলি তাদের একটাই: 'আস্‌লি নেহি মাংতা, সুদ্‌ লাও।' আসল চাই না, সুদ চাই। মাসে টাকায় দু-আনা সুদ। দশ টাকা নিলে চার সপ্তাহে চার কিস্তিতে শোধ দিতে হবে আসলের দেড়া।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ডান হাতে ন-নম্বর গলি। চাঁচের দেয়াল কাত হয়ে হেলে পড়েছে। ঘর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ভেতর অব্দি ঢুকে গেছে রাস্তার নর্দমা। দরজা বলে কিছু নেই। কুকুর আটকানোর জন্যে ছেঁড়া চটের শুধু পর্দা ঝুলছে। রাস্তা থেকে ঘরের মেঝে দু-তিন ফুট নিচু। চারদিকে ভন্‌ভন্‌ করছে মাছি।

একটু এগোলে নজরে পড়ে কোন্‌ এক সর্দারের হাল-ফ্যাশানের পাকা বাড়ি। ঘরে তার দু-তিনটে গোরুও আছে। নিজের দুটো মাঠকোঠাও আছে, ভাড়া খাটায়।

সর্দারের হপ্তা পঁয়ত্রিশ টাকা। হপ্তা যাই হোক, মাসে তার উপরি মেলে পাঁচ-ছ'শো টাকার এক আধলা কম নয়। গঙ্গার ওপারে মিলের বাবুদের এই বাজারেও নতুন নতুন কোঠা উঠছে; দোতলা বাড়ি তিনতলা হচ্ছে।

মেঘনা মিলের বেনারসীর সঙ্গে আলাপ হল রাস্তায়। সর্দারকে বাইশ টাকা ঘুষ দিয়ে বেচারা কাজে ঢুকেছিল। জ্বর গায়ে দু-দিন কামাই হবার পর জবাব হয়েছে।

কাজ যাবার ভয়ে অনিল জ্বর নিয়ে আর রামধনী মাজার ব্যথা নিয়েই কলে যায়। ঘুষ দিতে না পারলে ছুটি নেই। লেট্ হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

একটু এগিয়ে অ্যালায়েন্স সাউথ লাইন ওরফে নয়া বাড়ি।

সুলেমান মিঞার ঘরে গিয়ে উঠি। ছাঁচে-ঢালা পাঁচ-হাত লম্বা, দু-হাত চওড়া পায়রার ক্ষুদে ক্ষুদে খোপ। আট টাকা ভাড়া। একজনের পক্ষে এত ভাড়া মাসে মাসে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা ঘরে ন-দশজন ঠাসাঠাসি করে থাকে। থাকা মানে কোন রকমে চোখের দুটো পাতা এক করার মত একটু জায়গা বেছে নেওয়া।

সুলেমান মিঞার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে মনে হল এর চেয়ে ভাল খোলা আকাশের নিচে বেদের টোল। খানকয়েক ছেঁড়া উলিভুলি চট ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘরে একটিমাত্র জানলা। বন্ধ থেকে সেটা কুলুঙ্গির কাজ করে। সেখানে থাকে খানকয়েক রং-চটা কলাই-করা শান্‌কি আর টিনের কৌটো। বাইরের দাওয়ার ওপর গন্‌গন্ করে জ্বল্‌ছে কাঁচা কয়লার উনুন। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে আছে গোটা ঘর।

কম করে শ-পাঁচেক লোক থাকে এ-লাইনে। কেউ তাঁত-ঘরে, কেউ সেলাই-ঘরে, কেউ বা পাট-ঘরে কাজ করে। ভোর হতে না হতে টাট্টিখানার সামনে মারামারি লেগে যায়। গোসলখানায় ছাতা পড়ে এমন পেছল হয়ে আছে যে পা পাতা যায় না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হামেশাই লোকের মাথা ফাটে

পাকঘরের ঠিক কোল ঘেঁষে বারোয়ারী পেচ্ছাপখানা। ঝাড়ুদার দিনে একবার আসে। দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়।

মোড়ে মোড়ে একটা করে চোখে-ঠুলি-পরানো বিজ্‌লি বাতির আকাশ-প্রদীপ। কয়েক পা এগোলেই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়।

ডবল খাটুনি খেটে বাইরে দড়ির খাটিয়ার ওপর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছিল ইয়াকুব। দ্বারভাঙ্গায় দেশ তার। অন্ধকারে চোখ বুঁজে কী ভাবছিল জানি না। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসল ইয়াকুব। বলল: দেশে গ্রামঘরে হাজার হোক আলো হাওয়া আছে। কিন্তু যার জোতজমি নেই, দেশে তার ঠাঁইও নেই।

অক্‌ল্যাণ্ড মিলের দক্ষিণে এক গলি দিয়ে আসছি। হঠাৎ মাস্টার মশাই থেমে গেলেন।

শুনছেন? মেকানিক গোপাল মাঝি কাশছে!

শব্দ শুনলাম। পাঁজর ফেটে দমকে দমকে কাশির বেগ উঠছে। দাঁড়িয়ে থেকে শোনা যায় না। নিজেরই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

পাটঘরে পাটের আঁশ গলায় গিয়ে গলা সুড় সুড় করে। যক্ষ্মারোগীদের কাশির সঙ্গে দলা দলা রক্ত ওঠে। পাশে যারা থাকে তারা দেখেও দেখে না। দু-দিন পর তাদেরও তো গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। ছুটি চাইলে ছুটি পাওয়া যাবে না। কর্তাদের জানালে তক্ষুণি জবাব। মজুরের অসুখে এই হচ্ছে মালিকের দাওয়াই।

রোগ চেপে চেপে আজ একেবারে মরণদশা হয়েছে গোপালের। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। হাতে একটা পয়সা নেই যে ডাক্তার ডাকবে। এমনিতেই সংসার অচল হয়ে

পড়েছে। আঁতপুর ইস্কুলের সেরা ছাত্র ছিল নেপালের ভাই কেষ্ট। ইস্কুল ছাড়িয়ে তাকে মিলিটারিতে জান দিতে পাঠানো হয়েছে। একজনের জান গিয়ে যদি পাঁচজনের জান বাঁচে। কিন্তু সেও আর ক-দিন ?

গোলকধাঁধার মত জগদ্দলের গলি। কোন্‌খান দিয়ে কোথায় গেছে কিছুতেই ঠাহর পাওয়া যায় না।

মিস্ত্রি হরি চক্কোত্তির ইট-খসা ভিটেটা পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। পয়সাওয়ালা লোক বলে চক্কোত্তিদের এককালে নামডাক ছিল। অবস্থা আজ একেবারে পড়ে গেছে। নইলে কি শেষটায় লাজ-লজ্জা ঘুচিয়ে কারখানায় কাজ নিতে হয় ? ভাইয়ে ভাইয়ে কতই না বনিবনা ছিল আগে। আজ আর মুখ দেখাদেখি নেই। বাড়িতে পার্টিশান উঠছে। মন ছোট হয়ে গেছে অভাবে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া মিলে কাজ করত লছমী। কয়লার অভাবে ক-দিন ধরে কল বন্ধ। হাজারের ওপর মজুর বেকার হয়ে বসে আছে। কাজ না পেলে কেমন করে তারা বাঁচবে ? লছমী সারা দিন রেললাইনে আর ইছাপুর ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পোড়া কয়লা কুড়িয়েছে। সেই কয়লা ফেরি করে শস্তায় বেচে যা দু-চার আনা পয়সা পেয়েছে, লছমী তাই নিয়ে চোরাবাজারে চলেছে চাল কিনতে।

হীরালাল বলে, ফুরোনের তাঁতীরা সুতো পায় না। পাবে কেমন করে ? সব মিলেই স্পিনারের বেজায় অভাব। অন্য সব কারখানায় তারা বেশি মাইনের কাজ পাচ্ছে। কোন্ সুখে চটকলে থাকবে ?

ডবল খাটুনিতে মজুরির হার কমেছে। কোন কোন কলে মিস্ত্রি আর তেলওয়ালাদের মজুরি টাকায় পাঁচ আনা অব্দি ছাঁটাই হয়েছে। মাকু ভাঙলে, বেল্ট্ ছিঁড়লে কোম্পানি বদল দেয় না।

কাজেই তাঁতীরা নিজেদের গরজে গাঁটের টাকা ভেঙে খেসারত দেয়। ঘুষ না হলে সর্দার আর বাবুরা একপা নড়বে না। যেমন কাজ তেমনি রেট ঘুষের। তিন মাসের বদলী কাজ পেতে হলে ঘুষ দিতে হবে কম করে দশ টাকা।

এদিকে কিস্তিবন্দী সুদের জন্যে কাবলীওয়ালা আজকাল দু-বেলা শাসিয়ে যায় সিদ্দিক মিঞাকে। বেচারার সাতখানা রেশন কার্ডের মধ্যে তিনখানা কার্ড টাকার অভাবে অমনি পড়ে আছে।

না খেয়ে উজাড় হচ্ছে চটকলের সাড়ে তিন লক্ষ মজুর। বছরে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে চটকলের সাহেব আর দেশী মালিক।

গাঁ থেকে বেশি দিন হল আসেনি পার্বতীয়া। গোড়ায় গোড়ায় লাইনে এত লোকের মধ্যে বড্ড বাধো-বাধো ঠেকত তার। আস্তে আস্তে সব কিছু গা-সওয়া হয়ে গেল। কারখানার কাজে বেরোল পার্বতীয়া। না হলে সংসার চলে না। পেটে যদি খেতে না পায়, ইজ্জত ধুয়ে জল খাবে? কারখানায় জুলুম আছে অনেক। খাটায় বেশি, পয়সা দেয় কম। তার ওপর হজম করতে হয় সর্দার আর বাবুদের চড়-লাথি।

পার্বতীয়ার মুশকিল তার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে। ডবল শিফটে ঘরে ছেলে ককিয়ে মরে গেলেও দেখার কেউ নেই। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে কারখানায় পাঁচ মিনিটেরও ছুটি পাওয়া যায় না। তাই যাবার সময় ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে ছোট্ট ছেলেটার মুখে আফিং গুঁজে দিয়ে যায় পার্বতীয়া। আফিং খেয়ে মড়ার মত পড়ে থাকে দুধের বাচ্চা।

রাস্তায় আগে যে-বয়সের ছেলেরা সব খেলা করত, চাকা চালাত — সেই বয়সের ছেলেরা কেউ মিলিটারিতে বয় হয়েছে

কিংবা ফুকানলীতে কাজ নিয়েছে। পাড়ার ইস্কুল-পাঠশালায় মজুরদের পড়ুয়া ছেলে নেই বললেই চলে।

খঁয়রাতি ওষুধখানায় নবীয়ান বিবির দেড় বছরের মরো-মরো ছেলেকে দেখে ডাক্তার ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলে: দুধের ছেলেকে রেশনের চাল গিলিয়েছ, এখন বাঁচাই কি করে!

ঘরে ঘরে একই অসুখ। একে তো পুষ্টিকর কোন খাওয়া নেই, তার ওপর কাঁকর-ভর্তি পচা রেশনের চাল।

দাওয়াইখানার সামনে হাতে শিশি নিয়ে হৈ-হল্লা করে মজুরের দল। তারা চটে গিয়ে বলে: একঠো ঢাকোস্‌লা ঠারা করকে রাখা হ্যায়। কুছ্‌ভি দাওয়া নেহি মিল্‌তা, মিল্‌তা সিরিফ পানি।

লক্ষ্মীচাঁদ, নাথুনী, বিকাউ, সামরথী, আবদুল গণি, শ্যামা, মুরারি — সকলেরই সেই একই ইতিহাস। কারো যক্ষ্মা, কারো কুষ্ঠ। কারো ঘর ভেঙেছে, কারো ঘর ভাঙছে। তাদের ক্রুদ্ধ আক্রোশ চিমনির মুখে ধোঁয়ার মত উচিয়ে ওঠে।

রাত্তিরে গরমের চোটে আর মশার কামড়ে যেদিন ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে তারা গ্রামদেশের কথা ভাবে। বাপদাদার ভিটেটুকু ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল খুব। দেনার দায়ে জমি লিখিয়ে নিয়েছিল গাঁয়ের মহাজন। পেটের ধান্ধায় চলে আসতে হল শেষে শহরে। কতই না লোভ দেখিয়েছিল ফাগু সর্দার। চটকলের চাকরিতে দু-হাতে টাকা। চোদ্দ বছর ধরে খালি-পেটে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে তারা চটকলের চাকরিতে কী মজা। সারা জীবন কাজ করেও চাকরি পাকা হয় না এখানে।

অত্যাচারে অত্যাচারে ভোঁতা হয়ে গেছে মানুষগুলো। মাঝে মাঝে তারা আগুনের মত দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, ফস্‌ করে নিভে যায়। বিহারী, বিলাসপুরী, বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়া। সাহেব

মালিকরা তাদের আলাদা আলাদা করে রাখে। তারা এক হলে সাহেবদের যে সর্বনাশ।

সাঁইত্রিশ সালে একবার ডুবতে বসেছিল চটকলের সাহেবরা। গঙ্গার দু'পার জুড়ে তিন মাসের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সমস্ত চটকল। মজুররা এক হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়ে জারী করেছিল হরতাল।

সেসব দিনের কথা ভুলে গেছে কি চটকলের মজুর?

ফিরতে রাত্তির হয়ে যায় অনেক। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। তাড়িখানা বন্ধ। তার সামনে অসংখ্য মাটির ভাঁড় মুখ উল্টে পড়ে আছে। গলিতে গলিতে গোপনে জুয়োখেলা চলেছে। একদল মাতাল হল্লা করে লাইনে ফিরছে।

ঘুমন্ত লাইন। মনে পড়ল মাস্টার মশাই, এরশাদ আর ইউনিয়ন অফিসের কথা। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে তারা ডেকে তুলছে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে। বাংলার বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবে তারা অত্যাচারের শাদা জগদ্দল পাথর।

·················চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা·················

কধুরখিল থেকে কাদা ভেঙে গোমদণ্ডী চলেছি।

জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ। রাস্তার দু-পাশে জঙ্গলের জটলায় আকাশ আছে কি নেই টের পাওয়া যায় না। দু-পা গেলেই একটা করে এঁদো ডোবা, তার একগলা শ্যাওলা। শুকনো পাতা জলে ভিজে বাতাসে পাঁক-পাঁক গন্ধ।

এমন যে অজ পাড়াগাঁ, সেখানেও একটা করে চায়ের দোকান।

কাঁচি সিগারেটের ছেঁড়া খালি প্যাকেট রাস্তার এখানে-ওখানে ছড়ানো।

যুদ্ধের আগে এমন ছিল না। সেপাই-পল্টনে সারা চাটগাঁ যে ছেয়ে গিয়েছিল। কাঁচা রাস্তা পাকা করবার কাজ পেয়েছিল হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। গাঁয়ে গাঁয়ে বসেছিল নানান জিনিষের দোকানপাট। যুদ্ধ খতম হবার পর অন্য সব দোকান উঠে গেল। কিন্তু থাকার মধ্যে থেকে গেল শুধু চায়ের দোকান। এ ক-বছরে চায়ের নেশা চাষীদেরও পেয়ে বসেছে।

কাঁধ-ভাঙা কাঁচের গেলাশগুলোর গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘোলাটে জল। গুড়ের নাগরীর মুখে বসেছে বোল্‌তাদের গোলটেবিল বৈঠক। দুধের কড়াইটায় লোভ লাগার মত মোটা সরের ওপর ভন্‌ভন্‌ করছে এক ঝাঁক মাছি। বাঁশের বাখারি জোড়া দিয়ে খদ্দেরদের বসবার উঁচু জায়গা। তবু চায়ের গেলাশ মুখের একদম কাছে নিয়ে গেলেও নাকে এসে লাগে বাতাসের পাঁক্‌-পাঁক্‌ গন্ধ।

একটু এগিয়ে বাঁহাতে ছ্যাতলা-পড়া একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। এই রাস্তাব শেষে কবিয়াল রমেশ শীলের বাড়ি।

রমেশ শীলের নাম জানে না চাটগাঁয়ে এমন গাঁ নেই। রমেশ শীলের গান শুনতে শুনতে রাত যে কখন ভোর হয়ে যায়, কারো খেয়ালই থাকে না। কারো কারো ভাবের ঘোরে এমন হয় যে, জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখ পড়ে দেয়ালের দিকে। মেঝে থেকে কড়িকাঠ অবধি চারপাশের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা অসংখ্য নাম আর সেই সঙ্গে নানা জায়গার ঠিকানা। গোটা গোটা অক্ষরে আঁকাবাঁকা করে লেখা। যারা লিখেছে, তারা যেন হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আর ভালবাসা উজাড় করে রেখে গেছে দেয়ালের গায়ে।

আর দেয়ালটা যেন কবির কাছে দেশসুদ্ধ মানুষের দেওয়া মানপত্র হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন গ্রাম্য কবি রমেশ শীল।

যা ভেবেছিলাম একটুও মিলল না। ভেবেছিলাম কবি যখন, তখন এত বড় লম্বা চুল হবে ; মুখটা হবে খুব গম্ভীর, ভাবুক-ভাবুক ; গায়ে থাকবে লম্বা-হাত পাঞ্জাবি ; আর কথা বলবে ছন্দের টানে হেঁয়ালির মতন করে।

ওমা, এ যে নেহাত আটপৌরে সাধারণ মানুষ। গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া। সারা গায়ে বার্ধক্যের বলিরেখা। রোদ্দুরে পোড়া তামাটে রঙ। অনেকখানি চওড়া কপাল। চুল উঠে যাওয়ার দরুন বোধহয় আরও বেশি চওড়া দেখায়। যাও বা চুল ছিল, এখন ধবধবে শাদা। হাসলে রমেশ শীলকে ঠিক দু-বছরের শিশুর মত দেখায়।

ঘরের মেঝের একপাশে গাদা-করা শুকনো খড়। ঘরের দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় গরিব গেরস্থের সংসার। দারিদ্র্যকে চাপা দেবার কোন চেষ্টা নেই।

মহা ফাঁপরে পড়লেন রমেশ শীল আমাদের দেখে। বিশেষ করে কলকাতার লোক। যত্নআত্তি না করলে ফিরে গিয়ে লোকের কাছে বলবে কী !

অনেক কষ্টে নিরস্ত করা গেল। এক কাপ চায়ের বেশি আর কিছু নয় — এই রফা হল। পেতলের ঘটিতে করে চায়ের জল চাপিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে তামাক সাজতে বসলেন রমেশ শীল।

বললাম কেমন করে গান বানাতে শিখলেন সেই গল্প আমাদের বলতে হবে।

টিকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে গল্প শুরু করলেন রমেশ শীল।—

সে কি আজকের কথা? তখন বয়েস হবে বছর বাইশ। গাছ-পালার শিকড় দিয়ে ঘা সারানোর ব্যবসা করতেন বাবা। আমিও শুরু করেছিলাম সেই পৈতৃক ব্যবসা। কিন্তু তাতে মন বসছিল না আমার। লোকের দুঃখকষ্ট আর নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসত।

সেবার জগদ্ধাত্রী পুজো। সদরঘাটে কবিগানের আসর হবে খবর পেলাম। গাইবেন চিন্তাহরণ আর মোহনবাঁশী। দুজনেই সেকালের নামকরা কবি। গিয়ে দেখি আসরের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। গান শুরু হয়ে গিয়েছে। একজন দেন চাপান, একজন কাটান। এক একটা কলি শোনে আর লোকে হৈ হৈ করে ওঠে ফুর্তিতে। কখনও মাথা ঝাঁকানি দিয়ে, কখনও দাঁড়িয়ে উঠে বাহবা দেয়।

সেই রাত্তিরে গান শুনে কবি হবার শখ আমায় পেয়ে বসল। তারপর দিন নেই রাত নেই, শুয়ে বসে আমার কেবল এক চিন্তা—কেমন করে ছন্দ আর মিল দিয়ে মনের কথা হাজার হাজার মানুষের কাছে বলা যায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটি আর মনে মনে কথার সঙ্গে কথা মেলাই — 'মনে'র সঙ্গে 'সনে', 'ভবে'র সঙ্গে 'রবে'। মিলের জন্যে সব সময় ছটফট করে মন।

এদেশে তখন সবেমাত্র রেলের লাইন বসেছে। গরিব চাষী-বাসীর জায়গাজমি কিনে নিচ্ছে বিদেশীরা এসে। নদীর দু-ধারে ফেঁপে উঠছে বিদেশীদের কারবার। সেই রাগে প্রথম আমি আস্ত গান বানাই। দু-চারজন সেই গান শুনে খুব তারিফ করল।

পরের বছর পুজোর সময় আবার সেই কবিয়ালদের জলসা বসেছে। গান গাইতে গাইতে গোড়াতেই চিন্তাহরণের গলা হঠাৎ ভেঙে গেল। মহা মুশকিল। চিন্তাহরণ না গাইলে আসর মাটি

হয়ে যায়। বায়না-করা গান; পালা পুরো করতে না পারলে বেচারীদের অনেক টাকা গুনোগার দিতে হবে। কিন্তু চিন্তাহরণের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না — এখন উপায়?

এমন সময় আসরের এক পাশ থেকে কয়েকজন মুসলমান এসে জোর করে আমাকে টেনে তুলল। বলল, আসর মাটি হয়ে যায় তুমি ওঠো।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সভায় দাঁড়িয়ে কবিগান করতে হবে ভাবলেই বুক শুকিয়ে যায়। তার ওপর শহর-বাজার জায়গা।

মোহনবাঁশী এসে পিঠ চাপড়ে বললেন, মেরে-কেটে দাদা রাত দশটা বাজিয়ে দাও, নইলে বায়নার টাকাটা মাঠে মারা যায়।

কী আর করব। যা থাকে বরাতে বলে কপাল ঠুকে উঠে দাঁড়ালাম।

গানের গোড়াতেই মোহনবাঁশী এমন যা তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন যে, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কথায় তীর দিয়ে মোক্ষম করে বিঁধলাম মোহনবাঁশীকে। গায়ের জ্বালায় মুখে যেন আপনা-আপনি কথা জুটে যেতে লাগল। জমে উঠল আসর। আমারও সাহস বেড়ে গেল।

এদিকে রাত দশটা কাবার হয়ে পরদিন সকাল দশটা বেজে গেল। আসর আর ভাঙতে চায় না। মোহনবাঁশীকে দুয়ো দিতে লাগল আসরের লোক — এতটুকু একটা ছেলের কাছে হিমসিম খাচ্ছে মোহনবাঁশী?

কিছুতেই কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। কিন্তু একটা রফা তো হোক। কাঁহাতক আর আসরে বসে থাকা যায়? লোকে চ্যাচাতে লাগল, — যোটক দাও, যোটক দাও।

যোটক দিতে জানলে তো আমি যোটক দেব? মোহনবাঁশীরও

রোখ চেপেছে নাবালক ছেলের কাছে যোটক সে কিছুতেই দেবে না। লোকে তখন আর উপায় না দেখে নিজেরাই আসর ভেঙে দিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল — মোহনবাঁশীর হার হয়েছে।

সেই থেকে আমার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বায়না পেতে লাগলাম। শুরু করে দিলাম গানের ব্যবসা।

— বলতে বলতে পুরানো দিনগুলোর মধ্যে যেন রমেশ শীল হারিয়ে যান। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক বোঝা যায় না।

আমাদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হুঁকোয় টান দিতে দিতে রমেশ শীল আবার শুরু করেন তাঁর জীবনকথা।

এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে গান গেয়ে কাটল কয়েক বছর। একদিন তিনি শুনলেন মাঝভাণ্ডারের পীরের কথা। অবাক কাণ্ড! সেখানে নাকি গান দিয়ে সব উপাসনা হয়। চাটগাঁর নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সুরে গান হয় সেখানে। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান বছরের একটা সময় সেখানে এসে জড়ো হয়। পীরকে দেখে মজে গেলেন রমেশ শীল। একটানা সাত বছর তিনি সেখানে গান গেয়ে কাটালেন।

আরও অনেক নামকরা কবিওয়ালা মাঝভাণ্ডারে গান গেয়েছেন, কিন্তু রমেশ শীলের মত এত জনপ্রিয়তা আর কেউ পান নি। হাজার হাজার লোক তাঁর গান শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মূর্ছা গেছে। এখানে গান গাইবার জন্যে পুরাণ আর কোরাণের অনেক কিছু পড়তে শুনতে হয়েছিল তাঁকে। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন

ধর্মের জবানিতে। তাই পূর্ববাংলার সমস্ত মুসলমানের কাছে রমেশ শীলের আরেক নাম 'মাঝভাণ্ডারের মাঝি।'

কিন্তু মাঝভাণ্ডারে মন টিঁকল না রমেশ শীলের। গাঁয়ের দুঃখী মানুষগুলো যে তাঁকে ডাকছে।

সমাজে নানা রকমের অন্যায় আর অবিচার চলেছে। লোকের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের কুসংস্কার। তার বিরুদ্ধে একা মাথা তুলে দাঁড়ালেন রমেশ শীল। অন্ধ মানুষগুলো তাঁর গান শুনে চোখে দৃষ্টি পেল।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন মেতে উঠলেন গ্রাম্য কবি রমেশ শীল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ — এইসব নিয়ে তাঁর বাঁধা গান লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লোকের দুঃখদুর্দশা নিয়ে তিনি গান বাঁধলেন। এখনও তার একটা কলি তাঁর মনে আছে :

'পাঁচ গজ ধুতি সাত টাকা
দেহ টেঁকা হয়েছে কঠিন
রমেশ কয়, আঁধারে মরি
পাই না কেরোসিন।'

তারপর সারা চাটগাঁ জুড়ে জ্বলে উঠল বন্দুক আর পিস্তলের আগুন। পুলিশের অত্যাচারে পুরো দু-বছর কবিগানের আসর বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে গান থামেনি। সূর্য সেন আর কল্পনা দত্ত, পাহাড়তলী আর জালালাবাদ নিয়ে তৈরি হয়েছে গান। সে-গান পুলিশের চোখ এড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর জোয়ার যখন নেমে গেল, তখন দেখা গেল চারিদিকে

পাঁক জেগে উঠেছে। কবিগান আবার শুরু হল বটে, কিন্তু সে গানের মধ্যে শুধুই কুরুচি আর কথার কচ্‌কচি।

রমেশ শীল তখন জেলার বাইশজন কবিওয়ালাকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুললেন। সবাইকে একসঙ্গে করে তিনি এই প্রতিজ্ঞা নেওয়ালেন যে, কুরুচিপূর্ণ গান কেউ গাইবে না। যদি কেউ গায়, তাকে একঘরে করা হবে। হাতে হাতে তার ফল ফলল।

এর পর এল যুদ্ধ। ছারখার হতে লাগল চাটগাঁ! কবিওয়ালারা মহা ফাঁপরে পড়ল। পুরনো গান আর লোকের মনে ধরছে না।

হুঁকোটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে এক মুখ হাসি নিয়ে রমেশ শীল বললেন :

'মুন্সিরহাটে হঠাৎ একটি চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা। হাতে তার একটা কাগজ। তার ওপর লেখা 'জনযুদ্ধ'। ছেলেটি বলল, নিয়ে যান পড়ে দেখবেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া পড়লাম। দেশের কথা ঠিক এভাবে জানবার কখনও সুযোগ হয় নি। নতুন ভাবে গান লিখতে মনে খুব উৎসাহ পেলাম। অনেক দিন ধরে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন হাঁচর পাঁচর চলছিল। এতদিনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলাম। ঠিক করলাম সারা চাটগাঁয়ে এবার গান দিয়ে মানুষ জাগাব। তারপর গাঁয়ে গাঁয়ে নতুন গান নিয়ে গিয়েছি। লোকেও যেন ঠিক এমনি গানের জন্যেই এতদিন ওত পেতে বসে ছিল। আমাদের গান তারা লুফে নিল।'

বলতে বলতে উঠে বসেন রমেশ শীল! কুঁচকে-যাওয়া চোখে-মুখে তাঁর জোয়ান বয়সের উদ্দীপনা।

ইচ্ছে ছিল না। তবু উঠতে হল। অনেকগুলো গ্রামে যেতে হবে।

বললাম, চাটগাঁ শহরে তো আসছেন আপনি। আবার আমাদের দেখা হবে।

লাম্বুরহাটে ঘুরে ঘুরে একদিন হাটের দর জেনে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একজন এসে বলল — দেখা করবেন ফণী বড়ুয়ার সঙ্গে ?

ফণী বড়ুয়া হচ্ছেন রমেশ শীলের সব চেয়ে প্রিয় সাক্রেদ। 'দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে, তবুও দেশ জাগিল না কেনে' — তাঁর গানের এ দুটো কলি অনেককেই গুন্‌গুন্ করতে শুনেছি।

হাটের মধ্যেই একটা ঘড়ি সারাবার দোকান। ঘরটা অন্ধকার। কেউ আছে কি নেই বোঝা মুশকিল। যেদিক থেকে ঠুক্-ঠুক্ ঠুক্-ঠুক্ আওয়াজ আসছিল, সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা লোক নিচু হয়ে হাতুড়ি ঠুকছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, দেখলে বয়স অল্প বলেই মনে হয়।

সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন — ইনিই ফণী বড়ুয়া।

মুখে সর্বদা একটা লাজুক-লাজুক ভাব। গায়ে হাত-গুটানো শার্ট। দেহে কিংবা মনে কোথাও জড়তা নেই। চাঁছা-ছোলা কথা, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। দেখেই ভাল লেগে যায় এমনি মানুষ।

একে হাটবার, তার ওপর খরিদ্দারদের ভিড়। বেচারীর ঘাড় তুলে কথা বলবার সময় নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু করে কথা হল। —

'খুব ছেলেবেলাতেই আমার বাপ-মা মারা যান। ইস্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি। দিনগুলো কী কষ্টেই না কেটেছে। কিছুতেই

কিছু ভাল লাগত না। ঠিক করলাম সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হব। অনেকদিন গিয়ে থাকলাম এক বৌদ্ধ মঠে। প্রথম প্রথম এত ভাল লাগত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই বুঝতে লাগলাম — পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই ধর্মের জগৎটা বাইরের জগৎ থেকে আলাদা নয়। গেরুয়ার নিচে এখানেও মুখ লুকিয়ে আছে হাজার রকমের বুজরুকি। তাই গেরুয়াতেও বৈরাগ্য এল। আরাকান পেরিয়ে চলে গেলাম বর্মায়। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারলাম না। বাঁচার কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

আবার ফিরে এলাম দেশে। এক ঘড়ির দোকানে শিখতে লাগলাম কাজ। ঐটুকু একটা বাক্সের মধ্যে কত রকমের যে কলকব্জা। দেখি আর আশ্চর্য হয়ে যাই। উড়ু উড়ু মন এতদিনে পায়ের নিচে মাটি পেয়ে গেল। সারাটা দিন চোখে মোটা কাঁচের ঠুলি লাগিয়ে কাজ করি আর রাত্তিরে এ-গাঁয়ে সে গাঁয়ে কবিগান শুনে বেড়াই।

দিনগুলো নেশার মত কাটে। গুনগুনিয়ে গান করি আর ঘড়ির বাক্সের মধ্যে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখি। হঠাৎ একদিন নিজের মনের ভেতর থেকে গান বেরিয়ে এল। কী যে ভাল লাগল সেদিন। এমনি করে ক্রমে গান বাঁধতে শিখে গেলাম। দু-একটা আসরে গান গেয়ে কিছুটা নামও হল।

গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে বেড়াতে পারলে আর আমি কিছু চাই না। কিন্তু যেতে পারি কোথায়? ঘাড়ের ওপর বড় সংসার। গান গেয়ে যা রোজগার হয়, তাতে এ-বাজারে চলে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও দোকানের কাজটা ছাড়তে পারি না। কাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে।'

তারপর ঘাড়টা উঠিয়ে লাজুক-লাজুক মুখের ভাব করে ফণী বড়ুয়া বললেন :

'ছেলেটাও হয়েছে এমন, আমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারে না। দু-দিন চোখের আড়াল হয়ে থাকলে আমারও মন ছটফট করে।'

এমন সময় একদল খরিদ্দার এসে ভিড় করে দাঁড়াল। জায়গা না দিলে তারা বসতে পায় না। কাজেই বিদায় নিয়ে উঠতে হল।

ফিরে আসবার আগের দিন চাটগাঁ শহরে হিন্দু-মুসলমানের একটা বড় জমায়েতের ব্যবস্থা হয়েছে। বক্তৃতার শেষে কবিগান। মূল গায়েন রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। গান শুনতে শহর ভেঙে লোক এসেছে।

চেয়ার-টেবিল নামিয়ে মঞ্চ খালি করে দেওয়া হল। তার ওপর ফরাস বিছিয়ে বসল একদল দোহার; একপাশে বড় ঢোলক আর কাঁসরঘণ্টা।

বেজে উঠল ঢাক আর কাঁসর। বাজখাঁই গলায় ঢাকের দ্রাম-দ্রা-ম্ দ্রিম্-দ্রাম্-দ্রাম্-দ্রিম্ আর তার মাঝখানে ঠাঁ-ই ঠাঁ-ই করে কাঁসরের সরু ক্যান্‌কেনে আওয়াজ।

উঠলেন রমেশ শীল। ঢাক আর কাঁসর থেমে গেল। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। দেখে চিনতেই পারি না। রমেশ শীলের এ যেন এক অন্য চেহারা। ঝোড়ো কাকের মত শাদা চুলগুলো আলুথালু হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। চোখ দুটো মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে। শরীরের রেখায় রেখায় যেন বিজলীর চমক। দেখে কে বলবে বাষট্টি বছরের বুড়ো!

সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নেমেছেন ফণী বড়ুয়া আর মজুতদার সেজেছেন রমেশ শীল! একটার পর একটা গান হচ্ছে। চাপান আর কাটান।

কিন্তু এ এক নতুন ধরনের কবির লড়াই। এর মধ্যে ব্যক্তিগত

গালাগালি নেই, অর্থহীন কথা-কাটাকাটি নেই — শুধু আছে তুটো আদর্শের মধ্যে ক্ষমাহীন সংগ্রাম।

চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে একের পর এক ছবি। আরাকানের রাস্তায় ঘরমুখো লক্ষ লক্ষ প্রবাসীর রক্তাক্ত পায়ের মিছিল। রাঙা-মাটিতে বোমা পড়ে, বোমা পড়ে পতেঙ্গায়, বোমা পড়ে কাছারির পাহাড়ে। সোনার দরে ধান বিকোয়, ধানের দরে জান বিকোয় — শহরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাঁয়ের মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় জমে ওঠে মরা মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। না খেতে পেয়ে হাত-পা ফুলে যায়, ঘা-পাঁচড়ায় দগদগ করে সারা শরীর। মনের মধ্যেও পচ ধরে।

এরপর গোটা হল জুড়ে একটি জিজ্ঞাসা গমগম করে ওঠে: চাটগাঁর মানুষ মরবে কি ?

ঢাক আর কাঁসর জলদ সুরে বেজে উঠে তোলপাড় করে তোলে যারা শুনছে তাদের মন। গায়ের লোমগুলো সকলের খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। হঠাৎ থেমে যায় বাজনা।

চড়া গলায় শপথের মত হুঙ্কার শোনা যায় : না, মরবে না। হলশুদ্ধ মানুষ ধনুকের ছিলার মত উঠে দাঁড়ায়। না, মরবে না চট্টগ্রামের মানুষ। ভাই-ভাই হাত মিলিয়ে তারা ভেঙে দেবে পরাধীনতার ষড়যন্ত্রকে। বজ্রের কানে তালা ধরিয়ে আওয়াজ উঠতে লাগল : হিন্দু মুসলিম এক হও।

শুকনো বারুদে আগুন লাগিয়ে গান শেষ হয়। কিন্তু সভা ভেঙেও ভাঙতে চায় না। হল আর মঞ্চ ভিড়ের চাপে এক হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি সেই জনসমুদ্রে ডুবে গেছে রমেশ শীল আর ফণী বড়ুয়া। অনেক চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে পেলাম না।

মেঘের গায়ে জেলখানা

মেঘের গায়ে জেলখানা। বিশ্বাস হয় না? দেখে এসো বক্সায়।

হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলে তিন দিন তিন রাত্তিরের পথ। টিকোতে টিকোতে যাবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন। থামবে সাহেবগঞ্জে। যেতে যেতে চোখে পড়বে সাঁওতাল পরগনার বেঁটে খাটো পাহাড়। বুঝতেই পারবে না কখন ছাড়িয়ে এসেছ বাংলা দেশ। সাহেবগঞ্জ থেকে ট্রেন বদলিয়ে সকরিগলি ঘাট। পারানির স্টিমারে সেখান থেকে মণিহারী ঘাট। ঢেউ দেখে ভক্তি হবে এমন গঙ্গা। রাত্তিরে স্টিমারের সার্চলাইটের আলোয় হঠাৎ দেখবে এক আশ্চর্য কাণ্ড। ওপারের উঁচু বাঁধের ওপর আলো পড়তেই একটা ধবধবে শাদা লাইন

ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল — যতটুকু আলো, ঠিক ততটুকু জায়গা জুড়ে দেওয়ালীর পোকার মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে শাদা বক না বলাকা? সার্চলাইটের কড়া আলোয় ওরা ভেবেছে বুঝি সকাল হয়ে গেল। এমনি করে সারা রাস্তা পাখিদের ভুল বোঝাতে বোঝাতে স্টিমার গিয়ে ভিড়ল মণিহারী ঘাটে।

তল্পিতল্পা নিয়ে হুড়মুড়িয়ে আবার ট্রেনে ওঠো। পূর্ণিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কখন দেখবে আবার বাংলাদেশে পৌঁছে গেছ। তুমি যেখানেই যাও বাংলাদেশ তোমাকে টেনে নেবে।

মেঠো রাস্তার ওপর দিয়ে কাতারে কাতারে চলেছে মানুষ। মাথায় রংবেরঙের পাগড়ি। গোরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর লাল নীল কাগজের নিশান। আকাশে ঠেলে উঠেছে চাকায়-তাড়ানো ধুলো। ছোট্ট ছোট্ট পিলে-মোটা ছেলেদের হাতে তালপাতার ভেঁপু। মেলা থেকে তারা ফিরছে, একটু এগোলেই তা বোঝা যায়। ইস্টিশানের কাছেই একটা মাঠে চনচনে রোদ্দুরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ছাতি আর ছাতি। উবু-হয়ে-বসা আড়ালের মানুষগুলোকে দেখা গেল না। একটা কিছু তামাসা হচ্ছে সেখানে। চারপাশে তাঁবু পড়েছে। গমগম করছে সারা তল্লাট।

দিন গিয়ে রাত। রাত গিয়ে দিন। হিমালয়ের কোলের কাছে ঘেঁষে এল রাস্তা। বর্ষায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঢল নামে, জলের তোড়ে ভেসে আসে বড় বড় পাথর আর নুড়ি। শীতকালে জল শুকিয়ে গেছে। ঢালু মাটিতে জেগে রয়েছে চিত্রবিচিত্র বড় বড় পাথর আর নুড়ি। স্টেশনগুলোর মজার মজার নাম। তিব্বতীদের দেওয়া। এককালে বাঘের উপদ্রব ছিল, নাম তাই বাঘডোগরা। হাতির অত্যাচার ছিল, তাই হাতিঘিষা। শিকারের ভাল জায়গা, নাম তাই নকসলবাড়ি।

মাঠের মধ্যে ছোট্ট শহর শিলিগুড়ি। চারদিকে পাহাড়তলীর

অরণ্য — তরাইয়ের গভীর জঙ্গল। তার মাথার ওপর ঢেউয়ের মত চলে গেছে একটার পর একটা পাহাড়। শিলিগুড়ি পেরিয়ে একটু ডান দিকে ঠিকরে গেল রাস্তাটা। সামনেই একটা লম্বা যেমন-তেমন কাজ-চালানো গোছের পুল। নিচে দিয়ে গেছে খরস্রোতা তিস্তা। লেপ্‌চারা বলে রংতু বা সিধা নদী। বড় বড় পাথর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি খড়ের কুটোর মত ভেসে চলেছে তার ক্ষুরধার জলে।

যেতে যেতে ছোট্ট একটা নেহাৎ নগণ্য স্টেশনে গাছপালার ভেতর দিয়ে আকাশের কপালের কাছটায় সোনার টায়রার মত ঝল্‌মল্‌ করে উঠল কী ওটা? একদল চেঁচিয়ে উঠল — কাঞ্চনজঙ্ঘা। সকালের সোনালি রোদ্দুর এসে পড়েছে বরফে-মোড়া পাহাড়ের চূড়োয়। সেদিকে তাকিয়ে চোখের পলক পড়তে চায় না। যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সেই দৃশ্য।

গাড়ি এসে থামে রাজাভাতখাওয়ায়। স্টেশনের গায়ে চায়ের ছোট্ট দোকান। বেঁটে বেঁটে কাঁচের গেলাশ। গেলা যায় না এমন বিশ্রী চা। তারই দাম দু-আনা। বাইরের উটকো লোক। কাজেই দাও মেরে নেবে।

হঠাৎ দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে ঠোঁটে আল্‌তার রং, কামানো মুখে পেন্টের দাগ আর চোখে টানা কাজল। চোখে মুখে রাত জাগার সুস্পষ্ট ছাপ। জিজ্ঞেস করতে হবে না, সে নিজেই বলবে — কাল আমাদের এখানে থিয়েটার ছিল কি না। আমাকে আবার ধরেছিল ফিমেল পার্ট করবার জন্যে।

আ মরণ, এই হাড়গিলে চেহারায় আবার ফিমেল পার্ট! কিন্তু দু-মিনিটেই ভাব হয়ে যাবে লোকটার সঙ্গে। বাড়ি তার যশোরের কোন একটা গাঁয়ে। দেশ ভাগ হবার পর হা-ঘরে হয়ে ঘুরতে

ঘুরতে এখানে এসে ঠেকেছে। ছোট্ট জায়গা। হয় রেল, নয় চা আর কাঠের চালানী কারবারের সঙ্গে জড়ানো এখানকার জীবন। খেলা নেই, সিনেমা নেই। মাঝে মাঝে মেরাপ বেঁধে শখের থিয়েটারে যা একটু আধটু বৈচিত্র্য।

যতদূর চা-বাগান, ততদূর পিচ-ঢালা মোটরের রাস্তা। সামনে ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যায় কালো কালো কবন্ধের মত পাহাড়।

মিলিটারি মেজাজে হু হু শব্দে চলবে ট্রাক। মনে হবে এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বে পাশের হাঁ-করা গড়ান জমিতে।

যেতে যেতে দু-পাশে চায়ের সবুজ পাতি। বেতের ঝুড়ি পিঠে বেঁধে কাজ করছে কুলিকামিনেরা। মুখের হাজার রকমের গড়ন। কেউ সাঁওতাল, কেউ ওরাওঁ, কেউ কোচ, কেউ পলিয়া। পুরুষদের হাঁটুর নিচে কারো কাপড় নেই। কারো কারো খালি গায়ে শুধু একটা সরু নেংটি। পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘর। কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকে। শুকনো শুকনো মুখ, সরু পাটকাঠির মত শরীর।

মাঝে মাঝে সাহেবদের রংচঙে বাংলো। সামনে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। দেউড়িতে দাঁড়ানো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আনকোরা নতুন গাড়ি। হঠাৎ তোমার চোখ বড় বড় হয়ে যাবে — ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে আজও যায়নি ?

ভাবতে ভাবতে জানতেই পারবে না কখন তুমি পার হয়ে এসেছ চা-বাগানের চৌহদ্দি। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়বে তোমার। পিচ নয়, খানাখন্দে ভর্তি মাঠ-ভাঙা রাস্তা। অসংখ্য ছোট ছোট কাঠের সাঁকো। কোনদিকে পরোয়া নেই, তারই ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ট্রাক। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাবে।

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ তোমাকে ঢেকে দেবে

ডুয়ার্সের বাঘ-ডাকা অরণ্য। দু-পাশে গভীর শালবন। গা-ছম্ ছম্-করা নির্জন ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা। এখানে চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ জানবে না। যতদূর দৃষ্টি যায় — না মানুষ, না বসতি। জঙ্গল যেন ফুরোতে চায় না।

দূরে পাহাড়ের যে-মাথাটা দেখা যাচ্ছিল সেটা আর চোখে পড়ছে না। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখা গেল মাটি নয় আর। কেবল বড় বড় পাথর আর নুড়ি। সামনে গণ্ডারের পিঠের মত কালো একটা দেয়াল। রাস্তাটা ক্রমেই ওপরের দিকে উঠছে। আর মোটরের ইঞ্জিনে কানে-তালা-ধরানো একটা প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ আওয়াজ ক্রমেই পঞ্চমে চড়ছে। একটু পরেই বোঝা গেল আমরা আর সমতলে নেই, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি।

খানিকটা ওঠার পর তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় এসে হঠাৎ ইঞ্জিনটা একেবারে চুপ করে গেল। গাড়ি যাবে না আর। সামনে একটা কাঠের ফলকে লেখা : 'সান্তালবাড়ি'। সামনে সশস্ত্র পুলিশের ফাঁড়ি। এখান থেকে বক্সা আরো দু-মাইল। চড়াই উজিয়ে যেতে হবে।

ততক্ষণে তোমাকে ছেঁকে ধরেছে ময়লা আলখাল্লা-পরা একদল ভুটিয়া ছেলেমেয়ে। তোমার ভারী ভারী বাক্স-বিছানাগুলো তারা বয়ে নিয়ে যাবে। তাদের চেহারার দিকে তাকালেই বুঝবে অসম্ভব গরিব তারা। তিন-চার বছরের রোগাপট্‌কা ছেলে-মেয়েদের কাঁধে ক্যানেস্তারার টিন। তার মধ্যে করে তারা মহাজনদের সওদা বয়। সারা দিন মোট বয়ে যা পায় তাতে পেটের ক্ষিধেটাও ভাল করে মেটে না। হাড়-লিকলিকে শরীরের মধ্যে শুধু পায়ের ডিমগুলো যা একটু মোটা।

থাকে ওরা পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে ছোট ছোট গাঁয়ে। খুব কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়। গাঁগুলোতে লোকও তাই

খুব কম। একটু সুযোগ পেলেই পুরুষেরা সব কাজ নিয়ে চলে যায় পুলিশ কিংবা পল্টনে। যারা পড়ে থাকে, তারা কেউ ছুতোর মিস্ত্রি, কেউ কাঠুরিয়া, কেউ ঘরামি, কেউ মোট বওয়ার কাজ করে।

এবার এক পাহাড় ছেড়ে আর একটা পাহাড়ে উঠতে হবে। খানিকটা জঙ্গলের রাস্তা। পাহাড়ের একেকটা খাঁজের কাছে গিয়ে ঘুর রাস্তার আড়াআড়ি গেছে সোজা রাস্তা — চোরবাটো। উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে যায়।

খানিকটা উঠে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই কানে আসবে ঝির ঝির শব্দ। একটানা নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ চমকে যেতে হয়। দেখা না গেলেও কাছেই কোথাও ঝরনা আছে। এতক্ষণ একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ঝরনার জল যেখান দিয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে কাঠের একটা পুল। পুল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই দু-একটা কাঠের ঘর দেখা গেল। ডাকঘর, জলকল আর বনবিভাগের অফিস।

একটা ছোট্ট খোলা মাঠের ঠিক আগে তেমাথায় এসে হারিয়ে গেল সেই রাস্তা। একটা রাস্তা উঠে গেল সামনে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে, অন্য রাস্তাটা বাঁ দিকে বেঁকে গেল ভুটান পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা তিব্বতের দিকে। মাসখানেকে যাওয়া যায় লাসায়।

ডানদিকে কাঁটাতারে ঘেরা জেলখানার চৌহদ্দি। গেটের সামনে চৌকি দিচ্ছে বন্দুকধারী সেপাই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখবে কুয়াশার মত কালো পর্দায় সমস্ত দিক ঢেকে গেল। সামনের লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তে আবার সব পরিষ্কার। যেন কোন যাদুকরের খেলা।

ও কিছু নয়, মেঘ। অনবরত আসছে আর যাচ্ছে। সেই মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বক্সার জেলখানা।

সমুদ্রের পিঠের ওপর আধ মাইল লম্বা একটা কাঠের পোল যদি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার মাথা বরাবর হবে এই জেলখানা।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে সবুজ ঘাস আর কাঁকরে মেশা ছোট্ট মাঠ। মাঝখানে মাঝখানে মাথা-উঁচু-করা শাদা শাদা আখাম্বা পাথর। বেড়ার পুবদিকে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যাবার রাস্তায় ছোট্ট একটা কাঠের পুল। তার নিচে দিয়ে গেছে একটা শুকনো ঝরনা।

জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর ওপর। মাঠের গা দিয়ে উঠেছে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার মুখে বড় একটা লোহার ফটক। ছোট্ট একটা গেট খুলে যাবে, তার ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে ঢুকতে হবে। বাঁদিকে জেলের অফিস, সেপাইদের ব্যারাক, চুনো-পুঁটিদের কোয়ার্টার।

তিন-তিনটে ফটক পেরিয়ে তবে জেলের অন্দর মহল। হঠাৎ দেখবে তোমার সামনে আকাশ ছাড়া কিছু নেই। কাঁটাতারে বেঁধা হলেও তবু তো আকাশ। আকাশের আর এক কোণে দেখবে পাহাড়ের আর একটা হাঁটুর ওপর একা একটা গাছ তার মরা ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের তিনটে খাঁজ। সারি সারি ঘর প্রত্যেকটা খাঁজে। পুরু পাথরের দেয়াল, রং-করা কাঠের ছাদ। ছাদের কাছ-বরাবর গরাদ-আঁটা গোরুর চোখের মত জানলা। ডবল দরজা — মোটা কাঠের আর পেটা লোহার। সামনে কাঁটাতারে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট উঠোন।

ভেতরে যত কাঁটাতার আছে, সমস্ত এক করলে লম্বায় কয়েক মাইল হবে। আঁকাবাঁকা অনেকগুলো রাস্তা। দিনের বেলায় আলো ঝোলানোর পোস্টগুলো দেখলে ঠিক মনে হবে ফাঁসির মঞ্চ।

দেয়ালের বাইরে একশো হাত অন্তর উঁচু করে তৈরি সেন্ট্রি-বক্স। তার ওপরে দাঁড়িয়ে দিন-নেই রাত-নেই পাহারা দেয় বন্দুকধারী সেপাই। বক্সার বন্দীশিবির দেখতে অনেকটা হিটলার জার্মেনির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মত।

জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড় দিক অদেখা থেকে যায়। আর জেল বলতেই মনে পড়ে আলিপুর, প্রেসিডেন্সি কিংবা দমদমের কথা। প্রথম যারা সাজা খাটে, তাদের জন্যে আলিপুর-নিউ সেন্ট্রাল। যারা বাস্তুঘুঘু, জেলের ভাষায় যাদের বলে বি-ক্লাস — তাদের জেল প্রেসিডেন্সি।

প্রকাণ্ড একটা চাবির রিং গলায় ঝুলিয়ে একটা দাড়িওয়ালা সেপাই কেবলি চরকির মত ঘুরছে — একবার এ-গেট খুলছে, একবার ও-গেট। রাম-দুই-তিন বলে লোক ঢোকাচ্ছে আর বার করে দিচ্ছে। পাছে ভুল হয় তাই দু-বার তিনবার করে গুনছে। মানুষগুলো যেন তার কাছে অঙ্কের একেকটা চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়।

ভেতরে ঢুকেই দেখবে দেয়ালের গায়ে ছাপার মত হরফে লেখা অনেকগুলো পোস্টার। গীর্জার সামনে যেমন মথি-লিখিত সুসমাচার লেখা থাকে তেমনি। তাতে লেখা আছে, চুরি করা মহাপাপ।

ছোট কঙ্কেয় চোখ রাঙিয়ে সাধুচরণ সেদিকে তাকায় আর হাসে। ছেলের নাম রাখার সময় সাধুচরণের বাপ কি ভাবতে পেরেছিল, তার ছেলেটা বড় হয়ে এমন করে নাম হাসাবে? গায়ে মাংস নেই সাধুচরণের। বছর পঞ্চাশ বয়েস। জয়নগরের কাছে এক অজ গাঁয়ে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে যায়। আত্মীয়দের বাড়িতে জায়গা হয়নি। পেটের জ্বালায় ছিঁচকে চুরি শুরু করে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে জেল হয়। জেল থেকে

বেরোয় পাকা সিঁদেল চোর হয়ে। তারপর থেকে কত বার যে জেলে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে একবার মন হয়েছিল ঘর-সংসার করার। চোরাই পয়সায় কিছু জায়গাজমিও কিনেছিল। বিয়ে করেছিল, একটা ছোট্ট ছেলেও আছে তার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তাকে ভাল থাকতে দেয়নি। রোজ রাত্তিরে প্রহরে প্রহরে চৌকিদারের খবরদারি। যেখানে যা কিছু হোক থানায় সাধুচরণের ডাক পড়বে। মোটা রুলের গুঁতো খেয়েও রেহাই নেই, গাঁটের কড়িও বেশ কিছু খসাতে হবে। মিছিমিছি এই জ্বালাতন পোড়াতনের চেয়ে চুরি করে জেলের ভাত খাওয়াই ভাল মনে করেছে সে। তবে ছেলেটার জন্যে আজকাল বড্ড মন কেমন করে। তাছাড়া শুকনো পড়ে আছে অতটা জমি। ছেলের নাম তার বিশে। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে — চোট্টা সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাত বিশে ডাকাত।

ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে ভাগ করা জেলখানা। সেপাই-কয়েদীরা ইয়ার্ডকে বলে খাতা। সাত খাতার নিচে কিলবিল করছে পঙ্গপাল। জেলের ভাষায় বলে, ছোকরা ফাইল। কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ পকেটমার। এরা সব সাধুচরণের অতীত, সাধুচরণ এদের ভবিষ্যৎ। গা শিউরে উঠবে দেখলে। আধো আধো কথা বলবার, ইস্কুলে ভর্তি হবার বয়েস। মানুষ করতে পারলে যাদের কেউ হত ইঞ্জিনিয়ার, কেউ মাস্টার, কেউ লেখক — তারা বড় হচ্ছে পকেট কাটার জন্যে, নিরীহ মানুষের গলা কাটার জন্যে। অধিকাংশই অনাথ শিশু, শহরের ফুটপাথে মানুষ। পাঠশালায় নয়, গুণ্ডার দলে এদের হাতেখড়ি।

এদের মধ্যে একজনের নাম মুস্তাফা। ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে, বছর দশেক বয়েস। দুনিয়ার কাউকে যেন কেয়ার করে না এমনি ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে। এণ্টালির ওদিকে কোন্ ইস্কুলে পড়ত।

বাপ তার রাজমিস্ত্রির কাজ করত। হঠাৎ একদিন তিনতলা-উঁচু বাঁশের ভারা থেকে পা পিছলে পড়ে মুস্তাফার বাপ মারা গেল। মাইনের অভাবে মুস্তাফার নাম কাটা গেল ইস্কুল থেকে। বিধবা মা, বড় সংসার, অনেকগুলো ছোট ছোট ভাইবোন। বস্তিতে থাকত এক পকেটমারের সর্দার। টাকার লোভ দেখিয়ে সে দলের খাতায় মুস্তাফার নাম লিখিয়ে নিল। এরই মধ্যে মুস্তাফা বার চারেক পকেট মেরে জেলে এসেছে। 'ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না?' জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ইচ্ছে করলেই কি যাওয়া যায়?'

জেলখানা একটা আলাদা জগৎ। চোর-ডাকাত-খুনী-গাঁটকাটা — এই নিয়ে উঁচু-পাঁচিল-তোলা এখানকার জীবন। আলো-হাওয়ার সঙ্গে আড়ি। আজব এখানকার ভাষা — না-বাংলা, না-হিন্দী। তেমনি ছিরি এখানকার জীবনের। জানোয়ারের পালের মত খোঁয়াড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বাঁচা। সূর্যদেব পাটে বসতেই সঙ্গে সঙ্গে লক্‌আপ — ঘরে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ। রাত ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁয়াড় খুলবে। সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে ফাইলে। গুনতি হবে, গুনতি মেলার তিন ঘণ্টা পড়বে। সেলাম বাজাতে হবে জেলার-জমাদারকে। পান থেকে চুন খসলেই পিঠে ডাণ্ডা কিংবা লোহার নাল-মারা বুটের লাথি।

এ-ছাড়াও আছে কেস্‌টেবিল। কারো নামে নালিশ হলেই ডাক পড়বে কেস্‌টেবিলে। কথায় কথায় ডিগ্রিবন্ধ, মার্কাকাটা, কম্বল ধোলাই কিংবা মাড়ভাত। কয়েদী দুরস্ত করবার হাজার ব্যবস্থা। ছোট্ট ছোট্ট নির্জন কুঠুরিকে বলে ডিগ্রি। চারদিক বন্ধ, কারো মুখ দেখা যাবে না। বন্ধ দরজার নিচে সরু ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেবে ঠাণ্ডা খাবারের সান্‌কি। মাসের পর মাস এমনি করে থাকতে হবে। কিংবা পায়ে পরিয়ে দেবে ভারী লোহার বেড়ি। বছরে তিন মাস সাজা মাপ করার নিয়ম আছে — তাকে বলে মার্কা।

কর্তাদের মন যোগাতে না পারলে মার্কা কাটা যাবে। কম্বল দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে লাঠি-পেটা করার নাম কম্বল-ধোলাই। জেলখানায় হামেশাই হয়।

ভেতরে ঢুকে মনে হবে যেন মধ্য যুগের একটা প্রকাণ্ড কারখানা। জেলের সব কাজ করানো হয় কয়েদীদের দিয়ে। শুধু জুতো সেলাই নয়, হাড়ি-মেথরের কাজ থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই। তাছাড়া আছে দড়িচাল্লি, ধোবিচাল্লি, ঘানিঘর, মিস্ত্রিঘর, ছাপাখানা, গোয়ালঘর, তরকারি বাগান — এমনি হরেক রকম ডিপার্ট।

কেনা গোলামের মত কয়েদীর দল বিনা মজুরিতে উদয়াস্ত এখানে খাটে। একটু ফাঁক পেলেই কয়েদীরা সেপাইদের দিকে নল্‌চে আড়াল করে বসে নেশা করতে, অন্য একদল বসে যায় তিন তাসে জুয়ো খেলতে। সবাই পারে না। যারা সর্দার গোছের, হাতে পয়সা আছে — জেল তাদের মুঠোয়। দুনিয়া টাকার বশ — এ তারা জানে। জানে বলেই তারা জেলে এসেও দল পাকায়, অন্য দলের লোককে ভাংচি দিয়ে দলে টানে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! জেলখানায় পয়সা? আইনে তো নেই! আইনে নেই বলেই টাকা রাখবার মজার কল করেছে তারা। তাছাড়া চোরের রাজত্বে যেখানে সেখানে টাকা রাখলেই বা থাকবে কেন? তাই নিজেদের গলার মধ্যে বানিয়ে নিয়েছে টাকা রাখার থলি। সেই থলির মধ্যে টাকা রেখে দিব্যি তারা নিরাপদে খায় দায় ঘুমোয়।

গলার মধ্যে থলি বানাতে কষ্ট আছে। ভারী একটা সিসের বল অনেকদিন ধরে গলার টাকরার কাছে রেখে দিতে হবে। যতই দিন যাবে ততই মাংস ছ্যাঁদা হয়ে সেটা বসে যেতে থাকবে। ভেতরটা দগ্‌দগে ঘা হয়ে যাবে। অসম্ভব যন্ত্রণা। কাছাকাছি

কেউ দাঁড়াতে পারবে না এত তুর্গন্ধ। বছরখানেক কাঁচা অবস্থায় থাকবে ঘা। তারপর সেই সিসের বল তুলে নেওয়ার পর ঘা যখন শুকিয়ে গেল তখন তৈরি হল গলার থলি। তার মধ্যে অনায়াসে সোনা-গিনি লুকিয়ে রাখো। কারো সাধ্য নেই টের পায়।

এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদী আছে। খাবার জিনিষে বিষ মিশিয়ে বিক্রি করেছে কেউ, কেউ করেছে নোট জাল কিংবা ব্যাঙ্কের লাখ লাখ টাকা চুরি — দিব্যি ভদ্রলোক সেজে তারা বুক টান করে ঘুরে বেড়ায়। কর্তামহল তাদের আপনি-আজ্ঞে করে, সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড়রা তাদের সমীহ করে চলে। বড়লোকের এবং বড় ঘরের ছেলে এরা। ট্রাম-বাসে পকেট মারেনি, ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করে হাজার হাজার গরিব বিধবার সংসারকে এরা পথে বসিয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছুরি দেখিয়ে এরা কারো হাত থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নেয়নি, খাবার জিনিষে বিষ মিশিয়ে দোকানে দোকানে সেই বিষ হাজার হাজার মানুষের হাতে বিলি করেছে। ছোটলোক নয় এরা। ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। পেটেও টান পড়েনি কোনদিন। এমন নরম মন যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায়। তাই হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও, শত সহস্র ছাঁ-পোষা সংসারকে পথের ফকির করে দিয়েও জেলে গিয়ে তারা সুখে আছে। কেননা তাদের বড় ঘর, বনেদি বংশ — তারা সুয়োরানীর ছেলে। আর যারা পেটের জ্বালায় পথ-চল্তি লোকের পকেট মেরেছে কিংবা জমি হারিয়ে পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে লাঠালাঠি করেছে তাদের জন্যে অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা। কেননা তারা গরিব, সাধারণ মানুষ — তুয়োরানীর ছেলে। জেলখানায় অসহ্য লাগে অপরাধের তুলনায় শাস্তির এই হেরফের।

কিন্তু এদের কারো জন্যেই তৈরি হয়নি বক্সার বন্দীশিবির। এ হচ্ছে এক বিশেষ জেলখানা।

দু-যুগ আগে ইংরেজ প্রথম তৈরি করেছিল এই জেল তার পুরনো কেল্লায়। ভুটানের কাছ থেকে লম্বা মেয়াদে ইজারা নেওয়া এই জায়গা। আরও ঘন জঙ্গল ছিল আগে। এখনও পাহাড়ের গায়ে শোনা যায় বাঘের ডাক। এখানকার মাটিতে ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায় বিষধর সাপ। বায়ু-দূষিত-করা জঙ্গলের হাওয়া ডন-কুস্তি-করা জোয়ান শরীরকেও কাঁপিয়ে দেয়। ঝরনার জলে থিক থিক করছে রোগের বীজাণু। কাছে-পিঠে বাজার নেই। অগ্নিমূল্য সব জিনিষ। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে ওষুধ অভাবে, হাসপাতাল অভাবে অবধারিত মৃত্যু।

নিজের দেশকে যারা ভালবাসে, তাদের আপন প্রিয়জনদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে সেদিন দূর দেশান্তরে বনবাস দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইংরেজ সরকার। আকাশের বুক চিরে দিয়েছিল তারা কাঁটাতারে, সেপাইদের হাতে লাঠির বদলে তুলে দিয়েছিল টোটাভরা বন্দুক।

আজ ইংরেজ নেই, তবু তার আগের ব্যবস্থাই বহাল আছে বক্সায়।

দেশকে ভালবাসা ছাড়া আর কোন অপরাধই যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়নি, আজও তাদের স্থান বক্সায়। আজও অনেকে এখানে আছেন, দু-যুগ আগেও যাঁরা এখানে ছিলেন। আছেন বয়োবৃদ্ধ খাঁ-সাহেব আর নীরদ চক্রবর্তী; আছেন ভগ্নস্বাস্থ্য শিবশঙ্কর মিত্র। যাঁর জীবন বাংলার অর্ধশতাব্দীব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস, সেই সতীশ পাকড়াশীও এখানে।

আর আছে বাংলার শহর-গ্রামের অগণিত মানুষের বিশ্বস্ত বহু প্রতিনিধি।

যারা দুরন্ত অজয়ের উদ্বেলিত তীরে দাঁড়িয়ে বন্যার মুখে বাঁধ বেঁধেছে, যারা অন্ধকার খনির গর্ভে পৌঁছে দিয়েছে উজ্জ্বল সম্ভাবনার খবর, যারা নুয়ে-পড়া ধানের শিষগুলোকে বর্শার ফলকের মত সাহসে টান করে দিয়েছে, চিমনির ধূমায়িত মুখে যারা তুলে দিয়েছে আগুনের ভাষা — ভুটানের গায়ের পাহাড়ে তারা বন্দী।

বাংলার মানচিত্রে খুঁজে পেলেও সে-দেশ বাংলা নয়। ইংরেজের ঘুঘু-চরানো ভিটেয় নির্বাসিত হয়ে আছে ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ আমার বাংলা।

হাত বাড়াও

শীতকালে শুধু পায়ের পাতাটুকু ডোবে এমন নদী তিস্তা। হেঁটে পার হবার সময় পেছনে যদি তাকাও দেখবে আকাশের পিঠে পিঠ রেখে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য। আসলে দৈত্য নয়, হিমালয় পাহাড়।

নন্দীগ্রামের এক অখ্যাত গাঁয়ে নোনা-লাগা তালগাছের বন পেরিয়ে আকাশের কোলের কাছে প্রথমে ছোট্ট একটা ফোঁটা, তারপর আস্তে আস্তে তালগাছের মত বড় হয়ে উঠল কী ওটা? আগন্তুক এক জাহাজের মাস্তুল। আর সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে ধূ ধূ করে উঠল নীল সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর।

এই আসমুদ্রহিমাচল আমার বাংলা — পর্বত যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা।

ফরিদপুরের গাড়ি আসতে তখনও অনেক দেরি। রাজবাড়ির বাজারে বসে আছি। পাতলা কুয়াশায় মোড়া পঞ্চাশের আকালের এক সকাল। একটু দূরে স্টেশনের রাস্তায় মিলিটারি ছাউনির পাশে একটা অদ্ভুত জন্তু দেখলাম। আস্তে আস্তে চার পায়ে এগিয়ে আসছে। চেনা কোন জন্তুর সঙ্গে তার মিল নেই। কুয়াশার মধ্যেও জ্বল্ জ্বল্ করছে তার ছুটো চোখ। একা থাকলে ভয়ে মূর্ছা যেতাম। কেননা সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন এক মায়া ছিল, যা বুকের রক্ত হিম করে দেয়।

আরও কাছে এগিয়ে এল সেই মূর্তি। রাস্তার ধুলো থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তার জ্বলন্ত ছুটো চোখ কুয়াশায় কী যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে। ঠিক মানুষের হাতের মত তার সামনে ছুটো থাবা। আঙুলগুলো যেন আগার দিকে একটু বেশি সরু। গায়ে একটুও লোম নেই। কোন্ জন্তু?

সামনাসামনি আসতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অমৃতের পুত্র মানুষ। বারো-তেরো বছরের উলঙ্গ এক ছেলে। মাজা পড়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। তাই জানোয়ারের মত চার পায়ে চলে। বাজারের রাস্তায় খুঁটে খুঁটে খায় চাল আর ছোলা।

ছুটে পালিয়ে এলাম স্টেশনে। কিন্তু আজও সেই ছুটো জ্বলন্ত চোখ আমাকে থেকে থেকে পাগল করে। ছু-হাতে সোনা ছড়ানো নদীমালার দিকে তাকিয়ে তার নিশ্বাস শুনি। সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেইসব খুনীদের সে সনাক্ত করছে — শহরে গ্রামে বন্দরে গঞ্জে জীবনের গলায় যারা মৃত্যুর ফাঁস পরাচ্ছে, মাথা উঁচু করে বাঁচতে দিচ্ছে না যারা মানুষকে।

সেই দুটি জ্বলন্ত চোখ শান্তি চায়। বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালি ফসলে, চাষীর গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি। কারখানায় কারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি। যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি-কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ঘনায়মান অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত চোখ জেগে আসমুদ্রহিমাচল এই বাংলায় পাহারা দিচ্ছে আর মাটি থেকে দুটো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। তোমরাও হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করো।